ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. এম. এম. নাসির উদ্দিন ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাজধানীর বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সংবাদিকদের ব্রিফ করেন— পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার মো. নিজামুল কবীর ১২ই ফেব্রুয়ারি গণভোট ২০২৬ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সংবাদকক্ষের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন— পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩২

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তারেক রহমানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

২০২৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি উৎসবমুখর পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগসহ এবারের বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন ছিল গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে বিজয়ী হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার শপথ গ্রহণ করে। নবগঠিত সরকারকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ সংখ্যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি প্রকাশ করা হলো।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি। সকল ভাষা শহিদ ও ভাষাসৈনিকদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। ভাষার প্রতি বাঙালির ভালোবাসা আর ত্যাগ নিজেদের অধিকার আদায়ে অনুপ্রাণিত করে নিরন্তর। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে আসে বাঙালির স্বাধীনতা। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার পর ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে। এ দিবস পালনের মাধ্যমে বাংলাসহ সকল ভাষাভাষী মাতৃভাষার মান-মর্যাদা সংরক্ষণে ব্রতী হবে। মাতৃভাষা ব্যবহারে সচেতনতাই হোক– ভাষাশহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা। যে কয়টি উৎসব ও আয়োজনে বাঙালি একত্রিত হয়, তারমধ্যে অন্যতম বইমেলা। চেতনার দ্যুতিময়ী একুশকেন্দ্রিক ভাষা আন্দোলন ও বইমেলা নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া বিশ্ব বেতার দিবসসহ অন্যান্য বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ* ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে।

আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/বিশেষ প্রতিবেদন

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর ভাষণ ০৪

ভাষা, জনগণ ও রাজনীতি ০৭
ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ভাষা আন্দোলন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা ১২
ড. এম আবদুল আলীম

বিদ্যা বনাম বিজ্ঞান ১৭
নাসরীন মুস্তাফা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বেতার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ২১
তানিয়া খান

ভাষার অধিকার, মাতৃভাষা চর্চা ও চৈতন্য ২৪
জাকির আবু জাফর

রক্তে রাঙা বর্ণমালা ২৮
মিয়াজান কবীর

গ্রন্থমেলার ইতিহাস এবং অমর একুশে বইমেলা ৩০
রহিম আব্দুর রহিম

ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম ৩৫
জামাল উদ্দিন

ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম ৩৭
মহিউদ্দিন আল আমান শাহেদ

ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং অমর একুশে বইমেলা ৩৮
নুরুল ইসলাম বাবুল

দেশে দেশে বসন্ত ৪১
প্রণোতোষ কুমার

বাগেরহাট-ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মাজার এবং সুন্দরবন ৪৫
জিয়াউল হক হাওলাদার

খ্যাতিমানদের তরুণবেলা: কবি শামসুর রাহমান ৪৮
প্রত্যয় জসীম

জামদানি বাংলার বয়নশিল্পের ঐতিহ্য ৫০
মিনা রহমান

আমাদের চলচ্চিত্রে ভাষা আন্দোলন ৫২
আপন চৌধুরী

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৫৪

গল্প

তিনশো টাকার সাইকেল ৫৭
আবু তৈয়ব মুছা

টিয়া পাখির পাঠশালা ৬০
জাহাঙ্গীর হোসাইন

কবিতা

৬২-৬৩
দেলওয়ার বিন রশিদ, হাসু কবির, নাটু বিকাশ বড়ুয়া, নাজীর হুসাইন খান, অরিত্র কুণ্ডু, খোরশেদ আলম নয়ন, শামসুন্নাহার সুমনা, ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন সুরকার শাহ নেওয়াজ ৬৪

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর ভাষণ

১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

শুরুতেই মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। হাজারো শহিদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পেরেছি। তাবেদার মুক্ত বাংলাদেশে জনগণের ভোটে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। দেশে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই যাত্রালগ্নে আমি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

স্বাধীনতাপ্রিয় গণতন্ত্রকামী প্রিয় জনগণের কারণেই দেশে আবার মানুষের অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমি দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বার্তা দিয়ে বলতে চাই, মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান তথা দলমত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী– এই দেশ আমাদের সবার। প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এই দেশকে আমরা একটি নিরাপদ ভূমিতে পরিণত করতে চাই। একটি স্বনির্ভর নিরাপদ মানবিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই বিএনপি সরকারের লক্ষ্য।

প্রিয় দেশবাসী,

ফ্যাসিবাদের সময়কালের দুর্নীতি দুঃশাসনে পর্যুদস্ত একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি, দুর্বল শাসন কাঠামো আর অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং কঠোরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের মনে শান্তি নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে আমাদের সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।

সারাদেশে জুয়া এবং মাদকের বিস্তারকেও বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা অবনতির অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং, জুয়া এবং মাদক নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সব রকমের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। জনজীবনে শান্তি ও

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চলবে বিধিবদ্ধ নীতিনিয়মে। দলীয় কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি অথবা জোরজবরদস্তি নয়; আইনের শাসনই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার শেষ কথা।

প্রিয় দেশবাসী,

আগামীকাল থেকেই সারাদেশে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র মাহে রামাদান। আমি দেশবাসীকে পবিত্র মাহে রামাদানের শুভেচ্ছা জানাই। রামাদান আত্মশুদ্ধির মাস। আমরা যদি আত্মশুদ্ধি শব্দটির মর্মার্থ উপলব্ধি করি তাহলে এই মাসে মানুষের ভোগান্তি বাড়ার কথা নয়। যদিও আমাদের অনেকের মধ্যেই এই মাসটিকে ঘিরে ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা লক্ষণীয়। আপনাদের প্রতি আমার বিনীত আহ্বান, রামাদানের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে এই মাসটিকে আপনারা ব্যবসায় মুনাফা লাভের মাস হিসেবে পরিগণিত করবেন না। দ্রব্যমূল্য যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না যায়, এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা দয়া করে সতর্ক থাকবেন।

হাজারো প্রাণের বিনিময়ে একটি মাফিয়া সিন্ডিকেটের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্র এবং সরকারের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। বিএনপি সরকার সকলক্ষেত্রেই অনাচার-অনিয়মের সকল সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর। ইনশাআল্লাহ।

ক্ষুদ্র-মাঝারি কিংবা ছোটো-বড়ো, সকল ব্যবসায়ীদের প্রতি বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ এবং স্পষ্ট। বর্তমান সরকার ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারণ উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায়। সুতরাং, সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা হবে, এ ব্যাপারে আপনাদের যে-কোনো ধরনের পরামর্শ কিংবা অভিযোগ শুনতে সরকার প্রস্তুত। ক্রেতা-বিক্রেতা-গ্রহীতা, এই সরকার সকলেরই সরকার। এই সরকার আপনাদেরই সরকার। আপনারাই ভোটের মাধ্যমে এই সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনারাই এই সরকারের শক্তি।

প্রিয় দেশবাসী,

পবিত্র রামাদান মাসে রোজাদারগণ বিশেষ করে ইফতার-তারাবিহ-সেহরি এই সময়গুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে চান। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে এরইমধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিয়েছি। অপচয় রোধ করে কৃচ্ছ্রসাধন প্রতিটি মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। অফিস-আদালতে বিনা প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন– পিআইডি

গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি খরচের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করাও ইবাদতের অংশ বলেই আমি মনে করি।

দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনসাধারণের প্রতি কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জানানোর আগে আমি সরকারের মন্ত্রী এবং বিএনপি সংসদ সদস্যদেরকে দিয়েই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি। বিএনপি'র সংসদীয় দলের প্রথম সভাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিএনপি থেকে নির্বাচিত কোনো সংসদ সদস্য সরকারি সুবিধা নিয়ে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আমদানি করবেন না এবং প্লট সুবিধাও নেবেন না। আমি আপনাদের সামনে বলেছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে বিএনপি সরকার মহানবীর (স.) 'ন্যায়পরায়ণতার' আদর্শ অনুসরণ করবে। আমি মনে করি, বিএনপি'র সংসদীয় দলের এইসব সিদ্ধান্ত 'ন্যায়পরায়ণতার' আদর্শেরই একটি অন্যতম প্রতিফলন।

প্রিয় দেশবাসী,

বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় যানজট অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণহীন। হাটে-মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ লাঘব করা না গেলে জনমনে স্বস্তিও ফিরবে না। রাজধানীতে জনসংখ্যার চাপ কমাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। মানুষ তার নিজ জেলায় কিংবা নিজের বাসা বাড়িতে থেকেও যাতে সহজভাবে সঠিক সময়ে অফিস-আদালত, ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারেন– সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সারাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই রেল, নৌ, সড়ক এবং সেতু মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয় করা হচ্ছে।

আমরা মনে করি, সারাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ-সুলভ এবং নিরাপদ করা করা গেলে একদিকে যেমন জনগণের শহরকেন্দ্রিক বা নগরকেন্দ্রিক নির্ভরতা কমবে অপরদিকে পরিবেশেরও উন্নতি হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের চারপাশে সমস্যার শেষ নেই। তবে সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনাও কিন্তু কম নয়। আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে এই জনসংখ্যাই হবে আমাদের 'জনসম্পদ'। আমরা নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে শুধু বাংলাদেশই নয়; বিশ্ব বাজারও আমাদের জন্য উন্মুক্ত।

তথ্যপ্রযুক্তির সিঁড়ি বেয়ে বিশ্ব এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করেছে। প্রযুক্তির এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সম্মান এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে কোনো না কোনো একটি বিষয়ে বা কাজে পারদর্শী হতে হবে।

দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থী এবং তরুণ যুবশক্তির উদ্দেশে বলতে চাই, মেধায়-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যত রকমের সহযোগিতা দেওয়া যায়, সব রকমের সহযোগিতা দিতে বর্তমান সরকার প্রস্তুত। কর্মসংস্থান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পর দেশে ফিরে গত বছর ২৫শে ডিসেম্বর আমি বলেছিলাম, দেশ এবং জনগণের জন্য 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'। ১২ই ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে আমার 'প্ল্যান পরিকল্পনা'র অনেক কিছুই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম।

আপনারা স্বাধীনতার ঘোষকের প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছেন। এখন এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সকল অঙ্গীকার পূরণ করার দায়িত্ব বিএনপি সরকারের। আমরা আমাদের পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছি, ইনশাআল্লাহ।

অঙ্গীকার পূরণের এই যাত্রাপথে আমরা ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও আপনাদের অব্যাহত সমর্থন প্রত্যাশা করি।

প্রিয় দেশবাসী,

সরকারপ্রধান হিসেবে আমি দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, নবগঠিত সরকার গঠনের সুযোগ দিতে যারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন কিংবা দেননি অথবা কাউকেই ভোট দেননি– এই সরকারের প্রতি আপনাদের সবার অধিকার সমান। বিএনপি সরকার বিশ্বাস করে, দলমত ধর্ম দর্শন যার যার, রাষ্ট্র সবার। এই দেশে, এই রাষ্ট্রে একজন বাংলাদেশি হিসেবে আপনার-আমার-আমাদের প্রতিটি বাংলাদেশি নাগরিকের অধিকার সমান।

প্রিয় দেশবাসী,

আল্লাহ আমাদের সবাইকে নিরাপদ এবং সুস্থ রাখুন। আল্লাহ আমাদের সকল ইতিবাচক পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের তৌফিক দিন। পবিত্র রামাদান মাস শুরুর শুভলগ্নে আল্লাহর দরবারে এই নিবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ভাষা, জনগণ ও রাজনীতি

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একটা ব্যক্তিগত কথা দিয়ে শুরু করায় বোধ হয় দোষ নেই। কয়েক যুগ আগে, সেই উনিশশো বাহাত্তরে, আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, নাম ছিল, 'বাংলাদেশে ইংরেজির অতীত ও ভবিষ্যৎ'। সেই সময়ে দেশের আরো অনেকের মতো আমারও ধারণা হয়েছিল যে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এত-দিনে ইংরেজির দুষ্ট আধিপত্যের অবসান ঘটবে। কয়েক যুগ পরে আবার সেই আরো অনেকের মতোই আমারও মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক ছিল কি সেই স্বপ্ন দেখা? তখন সদ্য-স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। সেই স্বপ্ন তো দেখার সময়। ইংরেজি চলে যাবে। বাংলাদেশে বাংলার প্রচলন হবে। সারা বিশ্বের কাছে বড়াই আমাদের যে, সর্বত্র বাংলা চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তো অবশ্যই। সব মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। পড়তে জানবে, লিখতে জানবে। আমরা গৌরবান্বিত হয়ে উঠব।

স্বপ্নটা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু স্বপ্নের ভেঙে-পড়াটাও অস্বাভাবিক ছিল না। কোনো দুর্ঘটনায় ভাঙেনি। বীজ লুকিয়ে ছিল ভেতরেই। নইলে বৃক্ষ বৃদ্ধি পেলো কী করে? সদ্য-স্বাধীন সেই দেশে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা তো বটেই, দেশবাসীর ব্যাপক অংশ, অত্যন্ত অল্পকিছু লোক বাদ দিলে বাকি সবাই স্বপ্ন দেখছিলাম নতুন এক জীবনের, নতুন এক সমাজের। আর সেই যে সাধারণ স্বপ্ন আমাদের, তারই পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকটা তারই আলোতে তৈরি হয়েছিল এই ধারণা যে– এদেশে ইংরেজির ব্যবহার যাবে কমে।

আমরা ধরে নিয়েছিলাম সর্বত্র বাংলা প্রচলিত হবে। হচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র যখন বাংলার প্রচলন ঘটবে তখন সেখানে ইংরেজির স্থান কী হবে বিবেচ্য ছিল সেটাই। আজ যখন সে-ঘটনা ঘটেনি, এখনো যেহেতু বাংলা প্রচলনের দাবি দাবিই রয়ে গেছে, ইংরেজির দাম বেড়েছে, নিশ্চিত বলা যায় আরো বাড়বে– তখন বাংলাদেশে ইংরেজির ভবিষ্যৎ নিয়ে না-ভেবে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার প্ররোচনাটাই বোধ করি অধিক স্বাভাবিক।

কয়েক যুগ আগে লেখা আমার এই প্রবন্ধে এ কথাটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম আমি যে– ইংরেজির জাগতিক প্রয়োজন হয়ত আর থাকবে না, কিন্তু দীর্ঘকাল যোগাযোগের ফলে তার সঙ্গে একটা মানবিক যোগাযোগের কারণ থাকবে। অর্থাৎ কি না চাকরি-বাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজি আর আমরা ব্যবহার করব না; কিন্তু সাহিত্য পাঠ, দর্শন ও বিজ্ঞানের যোগাযোগ, অনুবাদ ইত্যাকার প্রয়োজনে ইংরেজির একটা ভূমিকা থাকবে। কিন্তু যে স্থূল সত্যটাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে ঐ বক্তব্যে সেটি এই

যে– জাগতিক কারণটাই সব সময়ে বড়ো, সেটাই নিয়ামক। মানবিক কারণ শূন্যে ভাসতে পারে না, জাগতিক কারণের ওপর ভর করেই তাকে দাঁড়াতে হয় আসলে। ইংরেজির চর্চা মানবিক কারণে হবে এটা অনেককাল ধরে চেয়েছি আমরা, শিক্ষাভিমানীরা; কিন্তু মানবিক কারণকে তো আলাদা করা কঠিন হয় জাগতিক কারণ থেকে। সর্বোপরি মানবিক কারণ নিয়ন্ত্রিত হয় নিষ্ঠুর ও অনিবার্য জাগতিক কারণ দ্বারাই। শিক্ষা উপরকাঠামো, তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

ভ্রান্তি যেটা সেটা এই সম্পর্কটাকে না-মানার কারণেই। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছি আমরা, কিন্তু মূল আর্থসামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন না আনলে যে ঐ উপরের স্তরে রূপান্তর ঘটানো অসম্ভব সেটা ভাবিনি। আমি একা নই, অনেকেই ভাবেননি; স্বাধীনতা তো একটি পদক্ষেপ মাত্র, সেই পদক্ষেপ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, গেলে পা একসময়ে অবশ হয়ে আসে– তারপর হঠাৎ একসময়ে ধপ করে বসে পড়তে হয়। অথবা বলা যায় স্বাধীনতা একটি মঞ্চ যেখানে এলে কিছু না-কিছু করতেই হয়। নিস্পৃহ থাকা যায় না, থাকলে দর্শকদের চিৎকারে পালাতে হয় মঞ্চ ছেড়ে। এগুতে হয়, কাজ করতে হয়। আমরা তা পারিনি। স্বপ্ন এগুতে সাহায্য করে, কিন্তু এগুনোর জন্য স্বপ্ন একমাত্র পাথেয় হতে পারে না। স্বপ্ন কর্মে উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে, কিন্তু নির্ভেজাল স্বপ্ন পর্যাপ্ত পুঁজি নয় কখনোই।

ইংরেজির প্রচলনের মধ্যে একটা জবরদস্তি ছিল, পরাধীন ছিলাম বলে। পাকিস্তান আমলেও ইংরেজি রইল পরাধীনতার কারণেই। আজকেও থাকবে স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি বলে। যে দেশের মাথার ঋণের বোঝা বাড়ছে কেবলি– সে দেশ নিজের ভাষায় কথা বলবে, নাকি কথা বলবে ঋণদাতাদের ভাষায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি আদৌ কঠিন?

বস্তুত ইংরেজি চর্চার বস্তুগত ভিতটা অবজ্ঞা করলে কোনো আলোচনাই যথার্থ হবে না। বস্তুগত অবস্থা হচ্ছে পশ্চিমের দেশগুলোর উপর নির্ভরতা। সেই অর্থনৈতিক নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে কী করে স্বাভাবিক হবে ইংরেজির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক?

আমি লিখেছিলাম, 'ভাষা ভাবের বাহক মাত্র নয়'। এ অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু এই সত্য কথাটার সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন না করলে তো ভুল হবে বিশ্লেষণ। ভাষা সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে, আমাদের ক্ষেত্রেও করেছে। দীর্ঘকাল আমরা পরাধীন ছিলাম, যে জন্য বাংলা আগে কখনো রাষ্ট্রভাষা হয়নি আমাদের। শাসকরা তাদের নিজেদের ভাষা সেটা– সংস্কৃত কখনো, কখনো ফারসি তারপরে ইংরেজি। সেই বিদেশি ভাষা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। গরিব মানুষেরাই বাংলা ভাষাকে ধরে রেখেছে। কিন্তু সেও মুখের ভাষা হিসেবেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। গরিব মানুষ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না-জানে লিখতে, না-জানে পড়তে। এই যে আমাদের বর্তমান শ্রেণিবিভাজন এতে ইংরেজি হচ্ছে উচ্চশ্রেণির মনোপলি। আবার, সঙ্গে সঙ্গে এই মনোপলি সৃষ্টিতেও ভাষা একটা ভূমিকা নিচ্ছে। অধিপতি শ্রেণির কাছে এ হচ্ছে একাধারে বিজয়ের চিহ্ন ও জয়ের অস্ত্র। উচ্চশ্রেণি ঔপনিবেশিককালের যে উত্তরাধিকার কাঁধে করে বটে কিন্তু সগৌরবে বহন করে চলেছে তার ভিত্তিমূল পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই প্রোথিত; যে-ভিত্তিমূল উৎপাটিত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু কার্যত যা মোটেই উৎপাটিত হয়নি। নব্য-উপনিবেশবাদ পুরাতন উপনিবেশবাদের-ই রকমফের বৈ তো নয়।

শাসকদের ভাষা উপরকাঠামোতেই থাকে না শুধু, অবকাঠামোকেও প্রভাবিত করে, আঘাত করে, ভেতরে ঢুকে অবস্থান নেয়। ইংরেজি শিক্ষায় চিত্তের মুক্তির দিকটা ছিল নিশ্চয়ই, সেটা মন্দের ভালো বোধ হয়; মন্দটা ছিল পরাধীনতা। ইংরেজি শিক্ষা পরাধীনতাকে স্থায়ী করতে চেয়েছে– ইংরেজভক্ত ও জনজীবন বিচ্ছিন্ন অথচ জনজীবনের ওপর প্রভাবশালী একটি শ্রেণি সৃষ্টি করে, শোষণের নির্মম সত্যকে শিল্প-সাহিত্যের পেলব অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুকিয়ে রেখে। আমরা মনে করেছি ইংরেজি শিক্ষা এদেশে রেনেসাঁস এনেছে, যে-রেনেসাঁস আসলে ছিল একটি অতিশয়োক্তি মাত্র। আমরা মনে করেছি ইংরেজি আমাদের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু সে-সাহিত্য ব্যাপক জনসাধারণের সামান্যতম উপকারে আসেনি; শাসকদের মাহাত্ম্য প্রচার করে যে বরঞ্চ ক্ষতিই করেছে। শ্রেণির লাভে দেশের ক্ষতি, অথচ ক্ষতিকর সেই লাভকেই দেশের মঙ্গল বলে প্রচার করেছি আমরা। কবি বিষ্ণু দে একদা যে মনোবৃত্তির কথা লিখেছিলেন, 'সদ্য-প্রয়াত যুক্তরাষ্ট্রের এবং খানিকটা বুদ্ধ ইংলণ্ড-যা আজও আমাদের পিতৃভূমি' (*সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ*, 'সেকাল থেকে একাল') সে মনোবৃত্তির আসল মূল্য এইখানেই যে, ওটি প্রতিনিধিস্থানীয়। একদা সাহিত্যিক আবুল ফজল মন্তব্য করেছিলেন, দেখতে পাচ্ছি, 'আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ'। (*আবুল ফজলের রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৫১) অন্য কোনো বিবেচনায় বলেননি, বলেছেন সাহিত্যের বিবেচনাতেই। মনোভাব একই।

ইংরেজ আমাদেরকে সাহিত্যে আধুনিকতা এনে দিয়েছে, কিন্তু সাহিত্য কি পরাধীনতার ক্ষতিপূরণ হতে পারে? হয়েছে কখনো? বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ইংরেজের উপর আমাদের জিতের কথা। 'বিশেষভাবে বাঙালির জিৎ এই কারণে যে, বাঙালা তার আপন স্বভাবের অনিবার্য ঝোকে ইংরেজের সাহিত্যকেই আপন করে নিয়েছে।' (*ইংরেজা সাহিত্য ও আমরা*, 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি', পৃ. ৮৩)

অন্যান্য প্রদেশের কেউ ইংরেজের আইন নিলো, কেউ গণিত, কেউ বাণিজ্য; আমরা নিলাম সাহিত্য। মিথ্যে নয় এই গ্রহণের

কথা, কিন্তু আবারো আসবে ঐ একই জিজ্ঞাসা, তাতে দেশবাসীর অর্থাৎ বিপুল অশিক্ষিত জনতার কী লাভ হলো? *আমার ছেলেবেলা* বইতে বুদ্ধদেব বসু আক্ষেপ করে বলেছেন, 'তবু বলবো যে এখনকার স্বাধীন ভারতের বিত্তশালা সমাজে যে ইঙ্গোন্মাদনার জোয়ার ডেকেছে (যেন ছেলেমেয়েরা ফিরিঙিটানে এক ধরনের খিচুড়ি, ইংরেজি বলতে পারলেই হলো।) সে রকম কিছুই আমার পরিবেশের মধ্যে ছিল না তখন। ইংরেজি ছিল আমার কাছে বইয়ের ও স্কুল-কলেজের ভাষা– জীবনের ভাষা বাংলা'। (পৃ. ১৩-১৪) কিন্তু বাস্তবিক ছিল কি এই বিভাজন-শিক্ষার ভাষার ও জীবনের ভাষার? শিক্ষার ভাষা কি আক্রমণ করেনি জীবনের ভাষাকে? না করলে কীসের শিক্ষা সেটা? কত গভীর? বস্তু কি নিয়ন্ত্রিত করে না চেতনাকে? আর ওই যে ইজোন্মাদনা তারও বীজ কি উপ্ত ছিল না সেকালের উন্মাদ ইংরেজি চর্চার মধ্যেই!

তাহলে কি আমরা বলব যে, একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে আন্দোলন হয়েছিল সে ছিল ইংরেজি চর্চার বিরুদ্ধে? অবশ্যই নয়। পাকিস্তানিরা কেউ কেউ সে কথা বলতে চাইত; কিন্তু আসলে আন্দোলন তো ছিল উর্দুর বিরুদ্ধে। তবে কি উর্দু চলে যাবার পর আন্দোলন শত্রু হিসেবে বেছে নিলো ইংরেজিকে? দৃশ্যত তাই। কিন্তু মূল সত্য আরো গভীরে। মূল সত্য এটি যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, ছিল গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে। সেদিন উর্দু ছিল উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিভূ। উর্দু চলে গেছে। আজ তার জায়গায় ইংরেজি এসেছে। ইংরেজির সাথে সামন্তবাদের সরাসরি সম্পর্ক নেই বটে তবে গোপন সম্পর্ক একটা অবশ্যই আছে; ইংরেজি উপনিবেশবাদের প্রসারিত জালের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। উর্দু-বিরোধিতার সঙ্গে ইংরেজি-বিরোধিতার একটা মৌলিক ব্যবধান আছে। উর্দুকে আমরা শত্রু হিসেবে চিনেছিলাম, ইংরেজিকে শত্রু মনে করি না; বরঞ্চ বিশেষ বিশেষ মহলে ইংরেজিকে মিত্র বলেই মনে করা হয়। উর্দুর প্রচলন আমাদের আত্মমর্যাদাবোধকে আক্রমণ করেছিল, ইংরেজি ব্যবহার তা করে না। বরঞ্চ ইংরেজি ব্যবহার করতে পারাটাই বীরত্বের চিহ্ন বলে গণ্য হয়ে থাকে। সর্বত্র ইংরেজির ব্যবহার ব্যাপক হচ্ছে, তা একুশে ফেব্রুয়ারিতে এসে আমরা যাই বলি না কেন। টেলিভিশনে দেশি পণ্যের বিজ্ঞাপনও ইংরেজি ভাষায় প্রচার করা হয় আজকাল। এটি একটি নির্ভরযোগ্য নিরিখ, কেননা পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন তো এমনি দেওয়া হয় না, ফলপ্রসূ করার জন্যই দেওয়া হয়। বোঝা যাচ্ছে ইংরেজি বিজ্ঞাপন অধিক ফলপ্রসূ বাংলা বিজ্ঞাপনের তুলনায়।

একথা কি বলা যাবে যে ইংরেজি বেশি চলছে বলেই বাংলা চলছে কম? দৃশ্যত তাই। কেউ যদি বলেন ইংরেজি প্রিয়তা আমাদের জাতিগত অপমান, বাংলা ব্যবহার দেশপ্রেমের লক্ষণ– তবে তার বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু আরো একটু গভীরে গেলে বলতে হবে যে, আসল কারণটা হলো আমাদের অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব। এই বন্ধ্যাত্বের কারণে আমরা বিদেশ-নির্ভর। বিদেশ-নির্ভরতার কারণে বিদেশি পণ্য, বিদেশি চাকরি, বিদেশ ভ্রমণ– সব কিছুই অত্যন্ত মূল্যবান আমাদের জন্য। বিদেশি ভাষাও তেমনি মূল্যবান– একই তালে, একই কারণে। দ্বিতীয় কথা, কেবল বাংলা ভাষায় বলে নয়, দেশে আমাদের সবকিছুরই গতি খুব স্তিমিত। আমাদের নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, তার উপর প্লাবন এসে জীবনের বাকি গতিটুকুকেও নিঃশেষ করে দিতে চাইছে। যতই যা বলি, এখনো আমাদের জীবনের গতি গরুর গাড়ির। অর্থনীতি-ই চালায় আমাদেরকে, গতি দেয় অথবা গতি কেড়ে নেয়। ব্যক্তিগতভাবে যতই অস্থির হই সমষ্টিগত গতির বাইরে যেতে পারি না শেষ পর্যন্ত। অর্থনীতির বন্ধ্যাত্বের কারণেই জীবনে গতি আসছে না, গতি আসছে না বাংলা ভাষার ব্যবহারেও। দেশের শতকরা ৭৮ জন লোক অক্ষর চেনে না, শতকরা ৮৫ জন লোক এমন দারিদ্র্যে বাস করে যে– আর্তনাদ ছাড়া ভাষা নেই তাদের মুখে। সেক্ষেত্রে বাংলার প্রচলনকে আমরা ব্যাপক ও প্রবল করব কেমন করে?

অর্থনীতিতে পুঁজির অভাব। পুঁজি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে বিদেশিরা; যারা তাদের ভাষা চাপিয়ে দিয়ে গেছে, অর্থাৎ আত্মসম্মানবোধের পুঁজিটুকুও বিপর্যস্ত করে গেছে। শ্রমজীবী মানুষের ভাষা বাংলা, অন্য কোনো ভাষা তারা জানে না। কিন্তু শ্রমজীবীরা যেমন দুর্দশাগ্রস্ত, বাংলা ভাষাও তেমনি সম্মানিত নয়।

মনপ্রাণে না হলেও অন্তত প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার প্রচলন চান না এমন লোক এদেশে বিরল। তবু বাংলা প্রচলিত হচ্ছে না কেন? কারণটা এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাধা দিচ্ছে শিক্ষিত শ্রেণিই। যারা চাইছেন বাংলার প্রচলন তাঁরাই দিচ্ছেন; বাধা ভেতরে ভেতরে, গোপনে গোপনে। ব্যক্তিগতভাবে বাধা না-দিলেও শ্রেণিগতভাবে অবশ্যই দিচ্ছেন বাধা। শ্রেণিই আসল বাধা, এ দেশে। শ্রেণিবিভাজনই প্রধান দুর্বলতা (অথবা সবলতা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি দেখছেন, তার ওপর।)

শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্কটাই হচ্ছে রাজনীতির মূল কথা। কোন শ্রেণি দেশ শাসন করবে, রাষ্ট্রযন্ত্র কার আজ্ঞায় চলবে বা চলবে না এবং সেই শাসক শ্রেণির সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির সম্পর্কটা কী হবে– এই সব প্রশ্নের মীমাংসা অন্য কেউ করবার অধিকার রাখে না, রাখে রাজনীতিই। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা যে শ্রেণির হাতে অবস্থান করছে, যে শ্রেণি বিভিন্ন নামে, দল বদলে, দল ভেঙে, দল গড়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে; তার পক্ষে বাংলার প্রচলন করা সম্ভব নয় তা এই শ্রেণি যতই তার সদিচ্ছার কথা বলুক না কেন।

বাংলা কেন প্রচলিত হচ্ছে না এই প্রশ্নের আপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য কারণগুলো বিবেচনা করে দেখা যাক। প্রচলিত না হওয়ার কারণ কী এই যে, দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বাংলা টাইপরাইটার নেই? কারণ কী এই যে, পরিভাষা প্রস্তুত হয়নি? নাকি এই যে, চলতি বাংলা ব্যবহার করবে। নাকি সাধু বাংলা এই প্রশ্নের মীমাংসা

এখনো হয়নি? এদের কোনোটাই বা সবগুলো একত্রেও যে আসল কারণ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসল কারণটা তবে কী?

বলা যেতে পারে কারণ হলো আমাদের মানসিকতা। হ্যাঁ, এই কারণটিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এটা কারণ বটে। কিন্তু কার মানসিকতা? সেটা প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই মানসিকতাটা এলো কোথা থেকে? জবাবে তো অবশ্যই বলতে হবে যে, মানসিকতাটা দেশের অধিপতি শ্রেণির। এবং সেই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, এই মানসিকতাটা গড়ে উঠেছে দেশের অধিপতি (অর্থাৎ ধনী) শ্রেণির বস্তুগত অবস্থান থেকেই।

অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোতে বাংলা প্রচলন যে সম্ভব ছিল না সেটা আমরা দেখে থাকি বা না থাকি, অত্যন্ত স্থূল সত্য ছিল। পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা চালু হবে এটা কেউ আশা করলে তাকে নিঃসন্দেহে পাগল বলা চলত, যদিও পাকিস্তানের বেশির ভাগ নাগরিকই ছিল বাঙালি। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবেই বাংলার দাবি তোলা হয়েছিল। সেই অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিও পারতপক্ষে মেনে নেওয়া হয়নি। মানা যখন হলো তখনও দায়সারা গোছের, কোনো আন্তরিকতা ছিল না তার পেছনে। কারণ কী? কারণ ঐ মানসিকতা। কার মানসিকতা? শাসক শ্রেণির মানসিকতা। শাসক শ্রেণি ছিল উর্দুভাষী। তারা তাদের ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল আমাদের ওপর। সেটা স্বাভাবিক ছিল তাদের পক্ষে। ঐ উর্দু ভাষা হতো আমাদের পক্ষে গোলামির স্মারক ও কারণ দুই-ই একাধারে। অতীতের শাসকদের মতো পাকিস্তানি শাসকরা তাদের ভাষা; এক্ষেত্রে উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল– একইভাবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এবং নিজেদের শাসনকে চিরস্থায়ী করবার অভিলাষে। ভাষাকে এমনিতে নিরীহ মনে হয়, কিন্তু ভাষা একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি। ইউরোপের ইতিহাসে দেখি মধ্যযুগের অবসানে যখন রেনেসাঁসের আবির্ভাবে নতুন জীবন মুখর হয়ে উঠছে চারদিকে তখন সেই জাগরণের অনুষঙ্গী ও সহায়ক হয়ে ধর্মীয় ভাষা ল্যাটিনের একচ্ছত্র আধিপত্যের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে জাতীয় ভাষাগুলো বিকশিত হচ্ছে। খোদ ইতালিতেই ল্যাটিনের জায়গায় আসছে ইতালিয়ান ভাষা। সামন্তবাদ ভেঙে পড়ছে, পুঁজিবাদ আসছে। দেশে দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের আবির্ভাব ঘটছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাচ্ছে এই জাতীয় বুর্জোয়াদের নতুন অথচ শক্ত হাতে। এই সমস্ত ঘটনার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল এবং এই রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবেই একদিকে যেমন ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কার হচ্ছে দেখি অন্যদিকে তেমনি দেখি জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অত্যাশ্চর্য উৎকর্ষ ঘটছে।

পাকিস্তানে আমরা পরাধীন ছিলাম তাই বাংলা চলেনি, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা চলে না কেন, চলবে না কেন? ঘুরে ঘুরে এই একই প্রশ্নে ফিরে আসি আমরা। চলে না এই কারণে যে, পাকিস্তান গেছে বটে কিন্তু পুরানো শোষণ যায়নি। সামন্তবাদ অনেকাংশে গেলেও উপনিবেশবাদ যায়নি, নব্য-উপনিবেশবাদ্ আরো শক্তিশালী হয়েছে। যে শ্রেণি-বিভাজন পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য ছিল তা স্বাধীন বাংলাদেশেও অক্ষুণ্ন আছে। বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছেন, কিন্তু এই বুর্জোয়ারা তো স্বাধীন নন, এঁদের চরিত্র জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্র নয়, চরিত্র মুৎসুদ্দির। এর কারণ হলো পুঁজির স্বাধীন বিকাশ এখানে ঘটেনি। সম্ভব ছিল না ঘটা। পুঁজি কৃষি উদ্বৃত্ত থেকে আসেনি। যেটুকু এসেছে তা পাচার হয়ে গেছে। পুঁজির জন্য তাই বিদেশের দিকে তাকাতে হয়। বিদেশি ব্যবসায়বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় দালাল কিংবা সহযোগীর ভূমিকা নিতে হয়। চাকরি খুঁজতে হয় বিদেশে। বিদেশি ঋণ বা সাহায্য ছাড়া দেশ এক সপ্তাহও চলবে না এমন একটা মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই যদি হয় তবে এই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি স্বাধীন হবে কেমন করে?

না, হয়নি। তাই দেখি বিদেশি অর্থ, পণ্য, চাকরি, ভাষা সবকিছুর প্রতি সমান আগ্রহ এ দেশের ধনীদের। তাদের ছেলেমেয়েরা পারলে বিদেশে যায় লেখাপড়া করতে, না পারলে মন খারাপ করে ভর্তি হয় এ-লেভেল, ও-লেভেলের বিদ্যালয়ে। তারা ইংরেজি ছবি দেখে ও বই পড়ে, ইংরেজিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের পিতা-মাতারাও তথৈবচ। বস্তুত না মেনে উপায় নেই যে, বাংলা ভাষায় চটপটে হওয়া যায় এই বোধ ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে দেশ থেকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ? আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছাড়া দেশ চলবে কী করে? আর আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কি আদৌ সম্ভব বাংলা ভাষায়? তাই দেখা যায়, যে পারে সে ইংরেজি ছাড়া বাংলা ব্যবহার করে না; না পারলে ভিন্ন কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় সেই সমস্ত বিষয়েই ছেলেমেয়েরা পড়তে ছোটে, যাতে ইংরেজির

১৭৬

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭

১৯৮৭ সনের ২ নং আইন

[৮ মার্চ, ১৯৮৭]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা — ১। (১) এই আইন বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞা — ২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে "অনুচ্ছেদ" অর্থে সংবিধানের অনুচ্ছেদ বুঝাইবে।

প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা — ৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

(২) ৩(১) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন কর্ম স্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির অধীনে অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা — ৪। সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যবহার আছে, বাংলা ভাষায় পড়তে হবে শুনলে শিক্ষার্থীর মুখ শুকায় এবং বাংলা সাহিত্য পড়তে বললে এমনকি কেঁদেও ফেলে। ইংরেজি বীরের ভাষা, বীরত্বের ভাষা, সেদিকেই ছুটছি সবাই– জ্ঞাতে অজ্ঞাতে।

রাজনীতি আরো একভাবে দায়ী বাংলা ভাষার অপ্রচলনের জন্য। যে রাজনীতি বিদ্যমান এদেশে তাতে জনগণের কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু জনগণের স্বার্থ দেখা হয় না। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশের জনগণই করেছে, নইলে এদেশ কিছুতেই স্বাধীন হতো না। কিন্তু স্বাধীনতার সুফল জনগণ যে পায়নি এটা অস্বীকার করবেন এমন কেউ নেই দেশে। স্বাধীনতার পর ধনীরা স্বাধীনভাবে, বেপরোয়া পন্থায় আরো ধনী হয়েছে; গরিবরাও এক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা পেয়েছে– গরিব হবার স্বাধীনতা। বহু মানুষ স্বাধীনভাবে মারা গেছে, আরো বহু মানুষ বাঁচা ও মরার মাঝখানে ধুকপুক করছে। গরিবের সংখ্যা বাড়ছে, ধনীর সংখ্যাও বাড়ছে। মেরুকরণ ঘটছে সমাজে, ধনবৈষম্যের মেরুকরণ। এমনকি একই পরিবার ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে– ঐ ধনবৈষম্যের ঘায়ে। প্রেম, প্রীতি, আত্মীয়তা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে টাকার কাছে। এর কোনোটাই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

আর এই যে শোষণ, এর ফলটা কী? ফল এই যে, গরিব মানুষ সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে ভাষার অধিকার থেকে।

আগের বিদেশি শাসকরা যে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল, স্বদেশি শাসনামলেও সেই অধিকার ফেরত পায়নি দেশের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ। সরকারি হিসাবই তো এ কথা বলে যে, শতকরা হিসাবে দেশের ২২ জন মাত্র অক্ষর চেনে, অক্ষরগুলো ঠিক মতো পড়তে পারে, কোনোমতে লিখতে পারে। বাকি ৭৮ জনের খবর কী? বাকি ৭৮ জন সেই অন্ধকারে আছে, 'যাতে নিমজ্জিত ছিল তারা যুগযুগান্ত ধরে। শাসকের বদল শোষণের বদল আনেনি।' রাজনীতি সেই আগের খাতেই বয়ে চলেছে।

আর তাছাড়া এ কথাটাও তো অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বাংলাদেশে কেবল বাংলা নয় কোনো কিছুই চলে না। যতই আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশি বিমানের আনাগোনা ঘটুক? আমাদের রেল স্টেশনগুলো যেমন ট্রেন এলে হঠাৎ জেগে ওঠে, চলে গেলে আবার পাশ মুড়ে শোয়, আমাদের সমাজও তেমনি। আন্দোলন হলে জেগে উঠি, তার পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। একবার যে জেগেছিলাম তা অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়। ঠিক যে কারণে দরিদ্র আমরা, বিশ্বের মধ্যে দরিদ্রতম, ঠিক সেই কারণেই আমাদের ভাষা তার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। দরিদ্রের কোনোকিছুই মর্যাদা পায় না। দরিদ্রের ভাষা বাংলা ভাষা, সেও মর্যাদা লাভ থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। আমরা দরিদ্র শোষণের কারণে। আমাদের ভাষা মর্যাদাহীন সেও ঐ শোষণের কারণেই।

তাহলে পথটা কী? কেমন করে আমরা বাংলাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি? মর্যাদাবান করে তুলতে পারি আমাদের মাতৃভাষাকে? পথ একটাই, সেটা হচ্ছে এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলা, যে সমাজে শ্রেণি-শোষণ বলে কিছু থাকবে না, এবং থাকবে না বলে উৎপাদনের যে শক্তি আজ আটকা পড়ে আছে নির্যাতনমূলক উৎপাদন সম্পর্কের নিগড়ে তা মুক্ত হয়ে যাবে এবং সেই মুক্তির স্রোতে দারিদ্র্য যাবে ভেসে। আমরা একটি উন্নত স্তরে উঠে যাবো সেদিন, সে দিন মানুষ প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা ভোগ করবে। তখন আমাদের ভিক্ষুক বলবে না কেউ।

এই কাজটা সহজ যে নয় তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এর কোনো বিকল্প নেই। ভাষা সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই। কেননা সমস্যাটা মোটেই ভাষাতাত্ত্বিক নয়। সমস্যাটা রাজনৈতিক। পাকিস্তান যে ভেঙে গেছে তার কারণ ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধ করেছে পুরানো শোষকের জায়গায় নতুন শোষক বসাবে বলে নয়, যুদ্ধ করেছে নিজেকে স্বাধীন, অর্থাৎ শোষণমুক্ত করবে বলে। কিন্তু শোষণমুক্তির সেই লক্ষ্য আজো অর্জিত হয়নি। আর অর্জিত হয়নি যে, তার একটা বড়ো প্রমাণ বাংলা ভাষার অপ্রচলন। শোষণ না থাকলে কারো সাধ্য ছিল না মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখে, তাকে রাখে অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে এবং বাংলা ভাষার ব্যবহারকে এমনভাবে সীমিত করে।

তাই বলা যায় যে, বাংলা ভাষার প্রচলনের আন্দোলন এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন একই আন্দোলন– অভিন্ন তারা মূলগত চরিত্রে। কেবল বাংলা ভাষার প্রচলনের জন্যেই যে সমাজ পরিবর্তন করতে হবে তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সমাজ পরিবর্তন করে একটি মানবিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যখন করা সম্ভব হবে কেবল তখনই বাংলা প্রচলিত হবে– ব্যক্তি জীবনের ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে এবং বলাই বাহুল্য যে, সমাজ পরিবর্তনের এই কর্তব্য পালন দেশের বিত্তবান শ্রেণি করবে না, করবে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষই– তাদের সঙ্গে সেই সব শিক্ষিত মানুষ বিশেষ করে তরুণের। যোগ দেবে, যারা শ্রেণিচ্যুত হতে পারবে, বেরিয়ে আসতে পারবে নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থের বাইরে।

অবিশ্বাস করবার কোনো-ই কারণ নেই যে, বাংলা একদিন প্রচলিত হবেই; যেমন অবিশ্বাস করবার কোনো-ই কারণ নেই যে, সমাজে একদিন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবেই। পাকিস্তান ভাঙা ছিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নয় মোটেই।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যাত্রার বিরাম নেই, সন্তোষের কোনোই অবকাশ নেই; যেমন প্রয়োজন নেই হতাশ হবারও। জনগণের সম্মিলিত, সমাজবিপ্লবী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা

ড. এম আবদুল আলীম

ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল ভাষা আন্দোলন নয়; ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, নিম্ন-বেতনভুক্ত কর্মচারীদের দাবি আদায়, মূলনীতিবিরোধী আন্দোলন– সর্বোপরি পূর্ববাংলার মানুষের সকল প্রকার অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবে যেমন, তেমনি জ্ঞান- সাধনা ও বিপ্লব-সাধনাকে সমন্বিত করার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়টি অনন্য অবদান রেখেছে। যে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শের মোহে এ অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তান নামক অস্বাভাবিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার বিপরীতে বাঙালির চিরায়ত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তার উন্মেষ ঘটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে স্থাপিত হলেও, তার স্থায়ী কাঠামো নির্মিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এ আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বলেছেন–'ঢাকা শহরের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। শিক্ষকদের মধ্যেও ভাষা আন্দোলনের সহানুভূতি ও সমর্থনের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।' ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন, সকল ক্ষেত্রেই তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে সরকারি রোষানলে পড়ে বহু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে; পুলিশি নির্যাতন ও জেল-জুলুম সহ্য করতে হয় অনেককে। শিক্ষকদের অনেকে যেমন চাকরি হারিয়েছেন, তেমনি বহু শিক্ষার্থীর ছাত্রজীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কারণে। কেবল তাই নয়, ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে কোনো কোনো শিক্ষককে দেশত্যাগ করতে হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়া আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর মূলে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে সৃষ্ট শোষণ-বঞ্চনাজাত নানা ক্ষোভ; যা পাকিস্তানি দুঃশাসনের অভিঘাতে প্রবল রূপে বিস্ফোরিত হয়। পাকিস্তানি শাসকরা নানা বৈষম্য সৃষ্টির পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন চালায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া এবং আরবি হরফে বাংলা চালুর উদ্যোগ রুখে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ও রাজপথের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলেও, এ আন্দোলনের রয়েছে

দীর্ঘ পটভূমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য; এবং তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পালন করেন গুরু দায়িত্ব। পাকিস্তান সৃষ্টির বহু আগে থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বক্তব্য দেন এবং প্রবন্ধ লেখেন। ১৯১৭ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র দ্বিতীয় সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি 'আমাদের ভাষাসমস্যা' শিরোনামে যে ভাষণ পাঠ করেন, তাতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড়ো হইতে পারিয়াছে?' পরবর্তী কালে ভাষা প্রশ্নে তিনি আরও সোচ্চার হন। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে সাধারণ ভাষা প্রশ্নে- যে মহাসভা আয়োজন করা হয়, তাতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'ভারতের সাধারণ ভাষা' শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি নানা যুক্তি তুলে ধরে বলেন–'সাহিত্যের শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে একটি মাত্র ভাষা সাধারণ ভাষার দাবী করিতে পারে। তাহা বাঙ্গালা ভাষা। ... যে শক্তিতে এক ভাষা দেশে সাধারণ ভাষা হইতে পারে সে শক্তি ভারতীয় আর কোন ভাষায় নেই।'

এক শ্রেণির তথাকথিত অভিজাত মুসলমান উর্দুপ্রীতির জোশে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করলে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রশ্নে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাতে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়, তার একাধিক অধিবেশনে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা ও মাতৃভাষা হিসেবে এর মর্যাদা সমুন্নত রাখার পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য মত তুলে ধরা হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের প্রাক্কালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দিকে হবু রাষ্ট্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে মুসলিম লীগ নেতারা উর্দু ভাষাকে তারা কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এতে বাদ সাধে পূর্ববাংলার সচেতন বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ, যার অগ্রভাগে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দুকে হবু রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাব করলে এর কড়া প্রতিবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি *দি উইকলি*, *কমরেড*, *দৈনিক আজাদ* প্রভৃতি পত্রিকায় ক্ষুরধার যুক্তি তুলে ধরে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন এবং জিয়াউদ্দীন আহমদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন: 'ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন রূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।' তিনি আরও বলেন, 'বাঙ্গালাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা।'

এভাবে পত্রপত্রিকায় কেবল প্রবন্ধ লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকার উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জোর তৎপরতা শুরু করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তা সমর্থন তো করেননি; বরং বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এতে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা তাঁর উপর রুষ্ট হন, কেউ কেউ তাঁকে 'টেরর পণ্ডিত' বলে প্রকাশ্যেই অপমান করেন। তাতেও ড. শহীদুল্লাহ্ দমে যাননি। পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষাবিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে তার প্রতিবাদে পূর্ববাংলার রাজপথে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাতে শামিল হন। তিনি বগুড়া আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘটের মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন। এছাড়া

পুরাতন কলা অনুষদ ভবনের সামনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রাক্কালে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

সেখানকার আলতাফুন্নেছা মাঠের হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গঠনে অবদান রাখেন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে 'বিদ্রোহ' করার ঘোষণা দেন। তিনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পুলিশি হামলার হাত থেকে রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশি হামলায় আহত ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী অনেক ছাত্রকে তিনি সেবা-শুশ্রূষা করেন। ছাত্র-জনতার শহিদ হওয়ার ঘটনা তাঁকে এতটাই মর্মাহত করে যে, তিনি তার প্রতিবাদে নিজের কালো আচকান কেটে ব্যাচ তৈরি করে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শোক পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খ্যাতিমান শিক্ষকের এমন দৃঢ় অবস্থান সেকালের জন্য সত্যিই বিপ্লবাত্মক ছিল, যা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে জোরালো করতে এবং ভাষা আন্দোলন বেগবানে বিশেষভাবে কাজ করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি ভাবাদর্শে পুরো দেশ যখন আচ্ছন্ন, তখন তিনি বাঙালিত্বের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাতে একজন দৃঢ়চেতা বুদ্ধিজীবী রূপে তাঁর শির যেমন উচ্চ হয়ে ওঠে, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের অগ্রণী ব্যক্তিরূপে তাঁর নাম সগৌরবে উচ্চারিত হতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাসেম এবং ফলিত রসায়ন বিভাগের শিক্ষক এ. এস. এম. নূরুল হক ভূঁইয়া ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক। তাঁরা তমদ্দুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন। জনমত গঠনে পুস্তিকা প্রকাশ, সভা-সমিতি আয়োজন, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন, ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন। আবুল কাসেম ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা–কী ও কেন?' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে তিনি তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে যেসব প্রস্তাবনা তুলে ধরেন, তাতে বলা হয়– বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা এবং অন্যান্য অফিসের ভাষা। এখানেই শেষ নয়, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে গঠন করা হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', যার আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এ. এস. এম. নূরুল হক ভূঁইয়া। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর বাংলা ভাষার দাবি আরও বেগবান হয়। এভাবে ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে তাঁরা ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করেন। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠলে আবুল কাসেম অন্যদের সঙ্গে অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য ছিলেন। ঐ সময় 'সাপ্তাহিক সৈনিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনে ব্যাপক অবদান রাখেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনায় ঢাকাসহ সমস্ত পূর্ববঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠলে পুলিশ তাঁর আজিমপুরের বাসভবন ও 'সাপ্তাহিক সৈনিক' অফিস ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। বাহান্ন-পরবর্তী সময়ে আবুল কাসেম একুশের চেতনা বিস্তার ও প্রসারে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে 'একুশ দফা কর্মসূচি'র অন্যতম ধারক-বাহক হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ ও শোকসভা আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইংরেজি বিভাগের রিডার ও কলা অনুষদের ডিন ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। এতে মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক আয়ার, অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় দশ দফা দাবি-সংবলিত প্রস্তাব পাস করা হয়; যাতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রচলনের দাবি জানানো হয়। এছাড়া পুলিশের গুলি চালনায় হতাহতের ঘটনায় নিন্দা, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন, সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, নিহত ও আহতদের পরিবারের যথোচিত ক্ষতিপূরণ দান ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির দাবি-সংবলিত প্রস্তাব পাস করা হয়। এই সভা আয়োজনের একদিন পর, অর্থাৎ– ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাতে আন্দোলনে সম্পৃক্ততার অভিযোগে জননিরাপত্তা অধ্যাদেশের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের গ্রেপ্তারের পর ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষকদের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাঁদের ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁরা কোনো প্রকার বেতন পাওয়ার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে সরকারের কাছে পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তীর রিডার ও বিভাগীয় প্রধানের পদ বাতিল করা হয়। মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীর প্রক্টর নিয়োগ বাতিল করে ১৬ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর নতুন একজন প্রক্টর নিয়োগের জন্য উপাচার্যকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

মাসখানেক বিনাবিচারে কারাবন্দি থাকার পর ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী জামিনে মুক্তিলাভ করেন। রাজরোষ থেকে বাঁচতে তিনি দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান এবং সেখান থেকে ১৯৫২ সালের ১৬ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবর পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জননিরাপত্তা অধ্যাদেশে গ্রেপ্তার হওয়া বিষয়ে কেন চাকরিচ্যুত করা হবে না মর্মে কৈফিয়ত তলব

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

করে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দাবি করে পত্র দেয়। তিনি কর্তৃপক্ষের চিঠির জাবাব দিলে তা সন্তোষজনক হয়নি মর্মে পূর্ববাংলার শিক্ষা সচিবের নির্দেশে একই বছর ১৬ই এপ্রিল হতে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। এভাবেই দেশভাগের পরে সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতা, ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততা এবং কতিপয় সহকর্মীর স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তের শিকার হয়ে পৃথীশচন্দ্র চক্রবর্তী নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করে কর্মজীবনের বাকি সময় সেখানেই অতিবাহিত করেন।

পৃথীশচন্দ্র চক্রবর্তী জামিনে মুক্ত হলেও মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী এবং মুনীর চৌধুরীর কারাজীবন দীর্ঘ হয়। মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে দিনাজপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়। পূর্ববাংলা সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৫২ সালে ২৪শে মার্চ ও ৪ঠা এপ্রিল তাঁর বিরুদ্ধে দুটি নির্দেশ জারি করা হয়। একটি নির্দেশে তাঁকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দিযোগ্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। আরেকটি নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার উৎখাত, আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়। আদেশে আটকাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বক্তব্য থাকলে তা দিনাজপুর কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে পূর্ববাংলা সরকার বরাবর পেশ করতে বলা হয়। তিনি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দেন। সরকারি নানা হয়রানি শেষে ১৯৫৩ সালের ৫ই মে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ সেটি গ্রহণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তা চ্যান্সেলরের কাছে প্রেরণ করা হয়। অবশেষে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী স্বপদে বহাল হন। মুনীর চৌধুরীকেও দিনাজপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫২ সালের ১৭ই মে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে তা নাকচ হয়। বরখাস্তের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের নীলক্ষেতের বাসা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকে ধার করা গ্রন্থসমূহ ফেরতদান ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য কারারুদ্ধ মুনীর চৌধুরীকে চাপ দেওয়া হয়। তিনি কারামুক্ত হয়ে সেগুলো পরিশোধ করবেন বলে আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। দীর্ঘ সময় বিনা বিচারে বন্দি থাকার পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৫৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল মুনীর চৌধুরী মুক্তি পান এবং একই বছর ১৫ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পুনর্নিয়োগ লাভ করেন। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সময় কারানির্যাতনের শিকার হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি থাকলেও দুঃখের দহনে এই প্রতিভাবান ও মেধাবী শিক্ষকরা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাননি। মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘কবর’ নাটক, যেটি সেখানকার বন্দিদের দ্বারা অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে এই শিক্ষকেরা স্বীয় মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব গুণে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞানের জগতে আলো ছড়িয়েছেন। তবে মুনীর চৌধুরীর শেষরক্ষা হয়নি। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এ দেশীয় দোসররা তাঁকে হত্যা করে।

ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে বিড়ম্বনা ও হয়রানির শিকার হন ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গকালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাভোগ করেন। এই কৃতী ছাত্র কারামুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক পদে চাকরির আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট থাকার পরেও

চাকরি না দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পান-বিড়ির দোকান দেন। এর প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ১লা মে তাকে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁর পিছু ছাড়ে না। নানা ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ১৯৫২ সালের ৪ঠা মে তা গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তিনি পুনরায় ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। মেধাবী ছাত্র ও কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে সরকারের রোষানলে পড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক শিক্ষক ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কারণে দমনপীড়নের শিকার হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেমন বাংলা ভাষার মর্যাদার সংগ্রামে শামিল হয়ে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জুলুম-নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন, তেমনি কোনো কোনো শিক্ষক উর্দু ও আরবি ভাষার পক্ষে ওকালতি করে সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে হয়, ইংরেজি বিভাগের রিডার ও কলা অনুষদের ডিন ইতরাত হোসেন জুবেরির কথা। তিনি পাকিস্তান সরকার তথা পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের 'আস্থাভাজন' লোক ছিলেন। ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। সিলেট এম. সি. কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দেন। ঐ সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাঁর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার রেজুলেশনে তিনি 'মার্ডার' শব্দটি লিখতে আপত্তি জানান এবং তার পরিবর্তে 'ডেথ' শব্দ অনুমোদন করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের গ্রেপ্তারে তাঁর হাত ছিল বলে ইতিহাসবিদ সালাহ্উদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেছেন। ইংরেজি বিভাগের আরেক অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন যদি ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলের অগ্রভাগে থাকতেন তাহলে 'সেদিনকার ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত'।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা অতি গৌরবের। এ গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রচনার পেছনে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে সৃষ্ট শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যাঁরা তথাকথিত মোল্লা ও পির; দুর্নীতিপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী আর বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিবিদ এবং শোষণকারীদের চিরাচরিত প্রভাব খর্ব করে বিনির্মাণ করতে চেয়েছে একটি আধুনিক সমাজ। এই তেজোদীপ্ত অংশটি সংখ্যায় কম হলেও উর্দুভাষী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন না হয়ে, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষণ এবং স্বীয় আত্মপরিচয় ও মর্যাদা সমুন্নত রাখায় বদ্ধপরিকর ছিল। এঁদের অগ্রভাগে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক। যাঁরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে লেখনী ধারণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এতে ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত যেমন নির্মিত হয়, তেমনি আন্দোলনের নেপথ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করলে ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষকেরা শক্তি-সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। কেবল তাই নয়, ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে সরকারের রোষানলে পড়ে বহু শিক্ষক অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। এতে অনেক শিক্ষকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও কর্মজীবন তছনছ হয়ে গেছে। তবুও তাঁরা মাথানত করেননি। ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তাঁরা যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি দুঃশাসন থেকে দেশবাসীর মুক্তির মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। এক কথায়, ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যে অবদান রেখেছেন, তা ইতিহাসে গৌরবদীপ্ত অধ্যায় হয়ে আছে।

সহায়কপঞ্জি

- আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন:* ইতিহাস ও তাৎপর্য, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫
- এম আবদুল আলীম, *ভাষাসংগ্রামী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৯
- এম আবদুল আলীম, *ভাষা-আন্দোলন-কোষ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০২০
- কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২৪
- তাজউদ্দীন আহমদ, *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৫২*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা : প্রতিভাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৪
- বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : সুবর্ণ সংস্করণ, ২০১৭
- মিজানুর রহমান খান, *'গোপন মার্কিন নথিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'*, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ই মে ২০১৭
- রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ২০১৫
- রাশেদ রাহম (অনুবাদ ও সম্পা.), *এলিস কমিশন রিপোর্ট–২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ : ছাত্রহত্যাকাণ্ড*, ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৮
- শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১
- সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০
- সালাহ্উদ্দীন আহমদ, ফিরে দেখা, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৮

ড. এম আবদুল আলীম: ভাষা আন্দোলন গবেষক ও লেখক, প্রফেসর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যা বনাম বিজ্ঞান

নাসরীন মুস্তাফা

পদার্থবিদ্যা আর পদার্থবিজ্ঞান কি একই বিষয়? বিদ্যা আর বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?

অধুনাকালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চ্যাটজিপিটি'র কাছে জানতে চাইলে জবাব মিলল– বিদ্যা (Knowledge) ও বিজ্ঞান (Science) দুটি ভিন্ন ধরনের জ্ঞান বা শিক্ষার ক্ষেত্র।

বটে!

আরও বিশ্লেষণ করে চ্যাটজিপিটি বলে– বিদ্যা সাধারণভাবে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান বা শিক্ষা বোঝায়, যা মানবজীবনের নানা দিক যেমন ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর হতে পারে। এটি একদিকে তত্ত্ব, নীতিমালা, মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান হতে পারে, যা কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে না হলেও মননের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– সংস্কৃতির ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মীয় শিক্ষাগুলো। বিদ্যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবন, সমাজ সংস্কৃতি, ও মূল্যবোধের গভীর উপলব্ধি।

অন্যদিকে বিজ্ঞান হলো একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংগৃহীত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং প্রমাণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম ও ঘটনাগুলোকে বোঝার জন্য প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে। বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের মাধ্যমে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। উদাহরণ হচ্ছে– পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, মহাকাশবিদ্যা, সাইকোলজি ইত্যাদি (চ্যাটজিপিটি দিব্যি কিন্তু বিজ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে পদার্থবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যার কথা বলছে!)। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা।

বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। আরও পার্থক্য?

চ্যাটজিপিটি জানালো–বিদ্যা মূলত মানবিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে তত্ত্ব ও দর্শন প্রাধান্য পায়। বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে। বিদ্যার লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি বোঝা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা। অন্যদিকে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতি ও বিশ্বের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ, প্রমাণিত জ্ঞান অর্জন ও তার ব্যবহার করা। বিদ্যা অনেক সময় ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হতে পারে, যা প্রমাণিত না-ও হতে পারে। আর বিজ্ঞান আবিষ্কার ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদান করে। এইভাবে, বিদ্যা ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক হলেও, তাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে মূল পার্থক্য রয়েছে।

এবার জানতে চাই, পদার্থবিদ্যা আর পদার্থবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য কী?

চ্যাটজিপিটি সেকেন্ডের মধ্যে জবাব দেয়– পদার্থবিদ্যা (Physics) এবং পদার্থবিজ্ঞান (Physical Science) একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হলেও, এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত, এ দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তবে এর মধ্যে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিভাষার পার্থক্য রয়েছে।

যেমন, পদার্থবিদ্যা হলো একটি নির্দিষ্ট শাখা, যা প্রকৃতির মৌলিক নিয়মাবলি, শক্তি, গতিবিধি এবং বস্তুর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এটি পদার্থের গঠন, আচরণ এবং এর বিভিন্ন শক্তি বা শক্তির ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করে। পদার্থবিদ্যা মূলত প্রকৃতির মৌলিক গঠন ও নিয়ম সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণা এবং মডেলিং পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। এর উদাহরণ হচ্ছে নিউটনের গতি সূত্র, তাপবিদ্যা, বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিকতা ইত্যাদি।

অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞান একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র যা পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) এবং জীববিজ্ঞানসহ (Biology) অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি সব ধরনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে পদার্থবিদ্যা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পদার্থবিজ্ঞান শব্দটি সাধারণত পদার্থবিদ্যা ও এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিজ্ঞানগুলোর সম্মিলিত অধ্যয়ন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, পদার্থবিজ্ঞান বলতে শুধু পদার্থবিদ্যা নয়, রসায়ন বা জীববিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এতক্ষণের আলোচনায় স্পষ্ট যে, বিদ্যা বলতে বোঝায় কোনো বাস্তব জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'সঠিক জ্ঞান'। বিদ্যা শব্দের মূল হলো বিদ (সংস্কৃত:), যার অর্থ হলো 'বিবেচনা করা', জ্ঞাতা, সন্ধান করা, জানা, অর্জন করা বা বোঝা। আর বিজ্ঞান হলো প্রকৃতিসম্পর্কিত জ্ঞান। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত

তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন। চ্যাটজিপিটি না বললেও আমরা জানি, বিদ্যা এবং বিজ্ঞান, দুটোই বাংলা শব্দ। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস বিষয়ক বই 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'-এ বিদ্যা ও বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরিচয় আমাদের জানা। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘকালীন মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মাধ্যমে বইটি প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছিলেন, "বিজ্ঞানের চর্চা ও বিজ্ঞানের পাঠ্য বই লেখা যে এদেশে ইউরোপীয়রাই আরম্ভ করেছিলেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন, তা শ্রীমান বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন। প্রথমে তাঁরা 'বিদ্যা' কথাটি ব্যবহার করতেন। এ রীতির রেশ এখনও রয়ে গেছে 'পদার্থবিদ্যা', 'উদ্ভিদবিদ্যা' ইত্যাদিতে। তার পরে এলো 'বিজ্ঞান' কথাটি ঊনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশকে– 'বিদ্যা'র মতোই জ্ঞানবিজ্ঞান এই ব্যাপক অর্থে। সাময়িক-পত্র 'বিজ্ঞানসেবধি' নামেই তার সাক্ষ্য। কিছুকাল পর্যন্ত 'বিদ্যা' ও 'বিজ্ঞান' দুই-ই চলছিল, তবে 'বিজ্ঞান' এর ব্যবহার বাড়তির মুখে। শেষে 'বিজ্ঞান' এর পক্ষে বোধ করি চরম রায় পাওয়া গেল ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞানরহস্য' বের করলেন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো ভাই কবি, সংগীতকার, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সুখপাঠ্য প্রবন্ধ বিদ্যা এবং জ্ঞান (পর্ব-১) প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শন পত্রিকার পঞ্চমবর্ষ দশম সংখ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'যাঁহারা বিদ্যাধনে ধনী তাঁহাদের বলে সুপণ্ডিত। যাঁহার জ্ঞানরত্নের খনি তাঁহাদের বলে পরম জ্ঞানী। যাঁহারা দুই-ই একাধারে তাঁহাদেরকে বলে সোনায় সোহাগা। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যা ও জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কিছু না কিছু আছে। সেই প্রভেদটির গুরুত্বের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মনে করিয়াছি; সেই সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানের দুই ভিন্ন পথের ঠিকানা নির্দেশ করিব।

বিদ্যা নানা, আর ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত। জ্ঞান এক, আর সেই এক জ্ঞানের লক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্য। বিদ্যা ও জ্ঞানের লক্ষ্য যেমন ভিন্ন পথও তেমনি ভিন্ন। বিদ্যার পথ হচ্ছে অসুরব্যতিরকের পথ, জ্ঞানের পথ হচ্ছে যোগের পথ। বলিলাম অসুরব্যতিরকের পথ, তাহা পদার্থটা কী? পদার্থটা আর কিছু না, জ্ঞতব্য বস্তুতে স্বজাতীয় লক্ষণের অশ্বর।

বিদ্যার পথ সকলের নিকটে পরিচিত জ্ঞানের পথ সকলের নিকটে হয়ত অপরিচিত। এই স্থলে বিদ্যার বাঁধার মধ্য স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া জ্ঞানের নিভৃত গুহা গহ্বরের পথ অভিমুখে ধীরে ধীরে পা বাড়ানোই সিদ্ধ। জ্ঞান তেমনি কীরূপে বিদ্যাকে গুপ্তভাবে সাহায্য প্রদান করে, তাহার কতকটা সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।'

অধ্যাপক সুকুমার সেনের লেখা থেকে জানতে পারি, ইংরেজদের আসার আগে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কোনো হদিশ নেই। পুরানো পুঁথি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, যেখানে মশাল-হাউই ইত্যাদি আতশবাজির মশলার কিছু ফর্মুলা লেখা ছিল। একে বিজ্ঞানচর্চা বলা যায় না, বড়োজোর 'ফলিত রসায়নচর্চার একমাত্র সাক্ষ্য' হিসেবে ভাবা যেতে পারে বলে তিনি মত দিয়েছেন। বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, এটাই বিজ্ঞানকে অন্য বিদ্যা থেকে পৃথক করেছে। প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি আগ্রহ আমাদের পূর্বপুরুষদের পর্যবেক্ষণে আগ্রহী করেছিল সত্যি। তবে তা মূলত দীর্ঘজীবন বা চিরজীবন লাভের জন্য তন্ত্রমন্ত্র জানার উদ্দেশ্যেই হতো। যারা তন্ত্রমন্ত্র জানতেন, তারা ছিলেন 'ডঙ্ক', যা কালে কালে 'ডাক' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। এরাই হাজার-দেড় হাজার বছর আগের বাংলার 'বিজ্ঞানী', যদিও একালের বিজ্ঞানীরা তা মানতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। কেনো মানবেন? ডাকদের বিদ্যা বিদ্যা-ই ছিল, তা কিছুতেই পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল তথা বিজ্ঞান নয়। তবে ডাকদের বিদ্যা কিন্তু 'বিদ্যা' হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। কালে কালে বিদ্যা চর্চাকারীদের নাম হয়ে গেল 'বৈদ্য'। পাল আমলের শেষার্ধে, আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর একজন বাঙালি পণ্ডিত ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অনুশীলনকারী এবং গবেষক বিখ্যাত হয়েছিলেন, যাঁর নাম চক্রপাণি দত্ত। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং একটি সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে উইকিপিডিয়ায় তথ্য আছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কথা কত শুনেছি, তাঁরা অনেক বই লিখেছিলেন বলে জানি। এঁদের মাঝে বাঙালি বিজ্ঞানী খুঁজতে গেলে হতাশ না হয়ে উপায় নেই। এজন্যই কি অধ্যাপক সুকুমার সেন বলছেন, ইংরেজরা এসে বাঙালিদের বিজ্ঞানসাহিত্য শিখিয়ে গেছে? এ পার্থিব জগৎ মায়ার সংসার– এই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাবনার প্রিয় বিষয়। অধ্যাত্মসর্বস্ব বাঙালির মনে সামগ্রিকভাবেই বাস্তবের হাওয়া দিয়েছিল ইংরেজ শাসন।

অথচ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বলা আছে, 'যখন কেউ বলবে আমি এ ব্যাপার চোখে দেখেছি, তখনই সেটা ঠিক সত্য বলে গ্রহণ করবে।' এরপরও প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আমাদের বাংলায় দর্শনের অংশ হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে বিদ্যা। বিজ্ঞান পশ্চিমা সভ্যতা থেকে আগত শিক্ষা। কালে কালে দর্শনের ছায়ায় এসে বিজ্ঞান, শিক্ষা, জ্ঞান ও বৃত্তি তথা বৈধ এবং সত্য জ্ঞান বলতে যা বোঝায়, তার সবটাই বিদ্যার আওতাভুক্ত বলে গৃহীত হয়েছিল। নিজস্ব ব্যাখ্যায় এভাবেই ব্যাখ্যায়িত হলো বিদ্যা ও জ্ঞান- বিদ্যার মাধ্যমে সত্তার পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার পর জ্ঞানের সূচনা হয়। এর অর্থ কি নির্বাণ লাভ? নাকি বিদ্যা লাভ করতে করতে মরে যাও, এরপর হয়ত জ্ঞানের সূচনা ঘটবে! এই দর্শন থেকে এখনও কি মুক্তি পেয়েছি আমরা? নইলে পার্থিব মায়ার সংসারে বিদ্যা নামক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকলেও বিজ্ঞানের সাধনায় আগ্রহ কেন কম? যত আবিষ্কার সব পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের।

বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে বিজ্ঞান তথা পশ্চিমা জ্ঞান তুলে ধরতে অনেক কৌশল নিতে হয়েছিল ইংরেজ সরকারকে। ১৮১৩ সালে

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বছরে এক লাখ টাকার অনুদান ঘোষণা করেছিল ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজে শিক্ষার পরিকল্পনা জানিয়ে ১৮১৬ সালে সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, যাতে তিনি লিখেছিলেন– কলেজে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দুস্তানি, ফার্সি ইত্যাদি ভাষার সাথে শিক্ষা দেওয়া হবে– 'arithmatic (this is one of the Hindu Virtues), history, geography, astronomy, mathematics;' ইত্যাদি। কলেজের নিয়মকানুন প্রণয়নের জন্য গঠিত সাবকমিটির রিপোর্টের শুরুতেই বলা ছিল, 'The primary object of this institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos, in the English and Indian languages and in the literature and Science of Europe and Asia.' ফলত ভারতবর্ষের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাতেও ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা শুরু হলো।

শ্রীরামপুর মিশনের মাধ্যমে ইংরেজ মিশনারীরা শুরু করল বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য প্রচারে *দিগদর্শন* পত্রিকার প্রকাশ। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি লন্ডনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে পাঠানো নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাথে সংগতি রেখে বিজ্ঞানবিষয়ক বই প্রকাশের উদ্যোগ নিলো। *দিগদর্শন* এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগেই যাত্রা শুরু করেছিল বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য। আর সেই বিজ্ঞান সাহিত্য আলোচনার পীঠস্থান হয়ে উঠল হিন্দু কলেজ। যদিও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছিল প্রথমে ইংরেজিতে, দ্রুত তা বাংলায় শুরু হলো এবং এর ফলে বাংলা ভাষাভাষীরা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হলো। দীর্ঘকালীন 'বিদ্যা' অর্জনের অভ্যেস 'বিজ্ঞান' চর্চায় পরিবর্তিত করতে বাঙালির কাছে প্রিয় মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগানো হয়েছিল। যেমন- পদ্যের ব্যবহার। বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। এর আগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পদ্যকারদের দখলে ছিল। পুঁথির মতো দীর্ঘ পদ্য দুলে দুলে পড়া হবে, যিনি পড়বেন তাকে ঘিরে বসে শুনবেন শ্রোতারা, এ-ই তো ছিল বাংলার সাহিত্যচর্চা। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম অঙ্ক বই মে-গণিত, যার বাংলা নাম অঙ্কপুস্তকং। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি চুঁচুড়া অঞ্চলের সরকারি স্কুলগুলোর প্রধান পরিদর্শক রবার্ট মে-এর লেখা বইটি প্রকাশ করেছিল। ধাঁধাগুলো ছিল কবিতায়। রবার্ট মে বুঝতে পেরেছিলেন, কবিতার পাতে শুষ্ক গণিতের অন্ন দিলে বাঙালি না খেয়ে পারবে না। সত্যিই তা-ই। বইটিতে কয়েকটি ধাঁধা ছড়া বলার মতো তেমন কিছুই ছিল না, তবুও এদেশীয় পাঠকরা লুফে নিয়েছিল। একটির উল্লেখ করছি।

মহীতে বসেছে পক্ষ আহারের তরে।
শঙ্কর কহিল ভুজ যোড় করি শিরে।
বসুর কাছে বাণ এসেছে কৃষ্ণ বড় সুখী।
ঘোড়ার উপর রাম বসেছে বেদে সমূদ্র দেখি।
রসের কাছে পাখি বসেছে খাবে হেন বাসি।
তার কাছে পঞ্চানন কোলে করে শশী।
অনূপচন্দ্র ভট্ট কহেন শুন কায়স্থের বালা।
সকল চাঁদের মধ্যে রন্ধ্রে তবে গাঁথিবে মালা।।

আরেকটি কৌশল ব্যবহার করেছিলেন ইংরেজ লেখকরা। ভারতীয় দর্শনে গুরু-শিষ্য বিষয়টি খুব জনপ্রিয়। গুরুমুখী বিদ্যা না হলে বিদ্যার দাম নেই, এমনই বিশ্বাস আমাদের। গুরু-শিষ্যের কথোপকথন স্টাইলে উইলিয়াম ইয়েটস অনুবাদ করলেন ফার্গুসনের 'জ্যোতির্বিদ্যা (An easy introduction to Astronomy for young persons), জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখলেন *জ্যোতিষ ও গোলঅধ্যায়, পিয়ার্সন লিখলেন ভূগোল ও জ্যোতিষ।* কথোপকথনে শিষ্য প্রশ্ন করছেন, গুরু উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানের তথ্য জানাচ্ছেন। চেষ্টা করা হয়েছে ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল রাখার। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো কাহিনির অবতারণা, যেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-এর বিজ্ঞানময় সংস্করণ! ১৮২৪ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম ইয়েটস এর *পদার্থবিদ্যাসার* বইটির পুরো নাম ছিল *পদার্থবিদ্যাসার*, অর্থাৎ বালকদিগের জন্য পদার্থবিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন Elements of Natural Philosophy and Natural History in A Series of Familiar Dialogue, Designed for the Introduction of Indian Youth' থেকে কিছুটা তুলে ধরছি বিষয়টি বোঝানোর জন্য:

'পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা–

শিষ্য: পৃথিবীর সৃষ্টি হইল কেন?

গুরু: প্রাণিবর্গের বসতির নিমিত্তে। পৃথিবীর অন্তরে ও উপরে ২ লক্ষ প্রাণী বসতি করিয়া সুখী হইবে এই জন্যে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল।

শিষ্য: পৃথিবী কীসের উপরে স্থাপিত আছে?

গুরু: কোন বস্তুর উপরে পৃথিবী স্থাপিত নয়, কেননা তাহা হইলে পৃথিবীর গমন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই জন্যে প্রাচীন লোকেরা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর পৃথিবীকে শূন্যভাগে রাখিয়াছেন।

শিষ্য: তবে কি আমাদের বসতিস্থান যে পৃথিবী সে কি শূন্যে ভ্রমণ করে?

গুরু: হ্যাঁ, কেবল পৃথিবী নয়, গ্রহগণও শূন্যে ভ্রমণ করে।'

পৃথিবী সৃষ্টির কারণ গুরুর কাছ থেকে জেনে সেকালের শিষ্য তৃপ্ত হলেও একালে তা ধোপে টিকবে না। আবার একেবারে উড়িয়ে দেবেন একালের পাঠক, সেরকম ভরসাও পাচ্ছি না। নিরেট বৈজ্ঞানিক তথ্যের চেয়ে দার্শনিকতার মোড়কে সাজানো বিজ্ঞান এখনো বাঙালির পছন্দের বিষয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ইয়েট্স এদেশের পাঠকের মনের ভেতর রাজত্ব করতে থাকা 'অধ্যাত্মবাদ'কে বিজ্ঞান আলোচনায় সাদরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সম্ভবত পাঠকদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে। গুরু-শিষ্যের

আলোচনায় কীভাবে 'পরমেশ্বর' এসেছেন, সেই উদাহরণ দিচ্ছি 'পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা' থেকে–

'শিষ্য: আঃ মহাশয়, যে শক্তি দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্ট হইয়া প্রথমাবধি প্রচলিত হইয়া এই কাল পর্যন্ত স্ব স্ব পথে রক্ষিত আছে সে শক্তি কি আশ্চর্য্য!

গুরু: পরমেশ্বর নিজশক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া আপন বুদ্ধির কৌশলে আকাশ বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে স্থাপিত করিলেন।'

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা ইউরোপীয়রা শুরু করলেও তাদের কৃত্রিম ও জটিল ভাষার হাত থেকে উদ্ধার করে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন যিনি, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। ১৮৪১ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার অনুমতিক্রমে অক্ষয়কুমারের প্রথম বই *ভূগোল* প্রকাশিত হয়েছিল। নানাবিধ ইংরেজ লেখকের ভূগোল বিষয়ক বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন, সরাসরি অনুবাদ না করে সহজ বাংলায় নিজের মতো করে তথ্য জানাতে চেষ্টা করেছেন। সফল হয়েছিলেন তিনি। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য জনপ্রিয় হয়েছিল।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধে বিচার' শিরোনামে অক্ষয়কুমারের লেখা নিবন্ধ থেকে কিছুটা উদাহরণ দিচ্ছি–

'মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানবদেহও ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকারে ঊর্ধ্বগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুত, আকর্ষণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা ঐ আকর্ষণ শক্তিরই কার্য্য। যেমন– শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদয় বেলুন তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। অতএব, এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতীক্রম ঘটে না।'

'পরমেশ্বর ঘটাইতেছেন' জাতীয় ব্যাখ্যা এড়িয়ে নিরেট বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপস্থাপন সেকালের বাঙালি পাঠক গ্রহণ করেছিলেন বলে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য ঠিক পথে ছুটতে শুরু করেছিল। লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের সাথে সাথে সেকালে পাঠককেও এর জন্য ধন্যবাদ জানানো জরুরি।

অক্ষয়কুমারের সবশেষ বইটির নাম *পদার্থবিদ্যা*। এর আগে, ১৮২৪ সালে উইলিয়াম ইয়েটস-এর *পদার্থবিদ্যাসার* এবং ১৮৪৭ সালে পূর্ণচন্দ্র মিত্রের পদার্থবিদ্যাসার প্রকাশিত হয়েছে। এই দুইটি বইকে পুরোপুরি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বই বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, কেননা কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা না থেকে ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে সার্থক বইটি লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত এই বইটির আলোচ্য বিষয় ছিল জড় ও জড়ের গুণ (Matter and its general properties)। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে নিরেট বিজ্ঞানের আলোচনাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালের বিজ্ঞান সাহিত্যিকরা এই ধারাটি বজায় রাখতে চেয়েছেন। পূর্বপুরুষের অভ্যেস মাঝে মাঝে বিচলিত করেছে, পুরোপুরি পশ্চিমী বিজ্ঞান আলোচনায় আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র *প্রাণময় জগৎ* গ্রন্থে যেমন দেখি, তিনি প্রাণের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার পাশাপাশি প্রাণের রহস্য সন্ধানেও ব্যস্ত থেকেছেন। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আকাশ ও ঈথার গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাহিত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর *অব্যক্ত*। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি নিষ্ঠাবান জগদীশচন্দ্রের *অব্যক্ত* পড়লে বোঝা যায়, অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবখানে মহাশক্তির উপস্থিতি অনুভব করেছেন তিনি। 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ'- শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন, 'যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজি সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্দ্ধাভিমুখেই সৃষ্টির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।'

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মাঝে কোনো বিভেদ তিনি দেখতে পাননি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত বলে ভাবতেন তিনি, আর তাই পেটেন্ট বাণিজ্যের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

শুরুতেই যে বলছিলাম, বিদ্যা মানবিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে তত্ত্ব ও দর্শন প্রাধান্য পায়। আর বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে। পশ্চিমা বিশ্ব বিদ্যার মায়ায় পড়েনি, পড়েছিলাম আমরা। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য সেই অবস্থা থেকে উঠে আসতে সময় নিয়েছে। এই কাজে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বড়ো ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর *বিশ্ব-পরিচয়*-এর ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, 'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্ত-ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

সহজ ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা কতটা হৃদয়গ্রাহী হতে পারে, তা জানতে প্রত্যেক বিজ্ঞান লেখকের উচিত *বিশ্ব-পরিচয়* পড়া। তিনি লিখেছেন, 'তথ্যের যথার্থে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যথাযথ বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।' অর্থাৎ, বিজ্ঞান মানে বিজ্ঞান-ই। এর আর কোনো অর্থ নেই।

নাসরীন মুস্তাফা: কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বেতার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

তানিয়া খান

এ যেন এক অদৃশ্যের মায়া, শব্দের অবিনাশী শক্তি। তরঙ্গায়িত এই শক্তি প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের সুর– যার নাম 'বেতার'। আমাদের শৈশবস্মৃতিতে প্লাস্টিকের আবরণে মোড়া, নব ঘুরিয়ে টিউন করা সেই রেডিও সেটটি হয়ত আজ ধুলো জমা এক ঐতিহাসিক প্রতীক, কিন্তু বেতারের আবেদন কি গেছে ফুরিয়ে? বরাবরই নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছে নতুন শিল্প; পুরানো শিল্পকে দিয়েছে নতুন রূপ (ভট্টাচার্য, ২০২৫)। তাইতো, রেডিওর ফরম্যাট বদলেছে অনেকটাই; রেডিও সেটের ডিজাইনেও এসেছে পরিবর্তন। অ্যানালগের পাশাপাশি, এটি এখন ডিজিটাল ডিভাইস বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সময়ের প্রয়োজনে জায়গা করে নিচ্ছে নতুনভাবে।

প্রতিবছর ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস (World Radio Day)। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ রেডিও প্রতিষ্ঠার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো ২০১১ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব বেতার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে (UNESCO, 2011)। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ রেডিও প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণ করেই এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে যোগাযোগ ও সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। ইউনেস্কো ২০১১ সালে এই দিনটিকে স্বীকৃতি দেয় এবং ২০১২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এটি গ্রহণ করে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে 'বিশ্ব বেতার দিবস' পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্ব বেতার দিবস

রেডিও আমাদের মনের থিয়েটারের মতো, উন্মুক্ত এবং স্বাধীন

এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী 'রেডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি উপকরণ; কণ্ঠস্বর নয় (Radio and Artificial Intelligence: AI is a tool, not a voice)Õ (UNESCO, 2026)। এই প্রতিপাদ্য আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে– প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির সময়ে, বেতারের আসল পরিচয় ও শক্তি কী? আমরা কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) বেতারের ধারক ও বাহক হিসেবে ব্যবহার করব, নাকি এটি হবে কেবল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার– যা বাচিকশিল্পীদের উচ্চারিত ধ্বনি-প্রতিধ্বনির আবেদনকে আরও সুদৃঢ় করবে? এআই কি বেতারের চালক, নাকি এটি হবে কেবল একটি শক্তিশালী উপকরণ? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন আরও গভীর তাৎপর্য বহন করে। একদিকে যেমন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দেখানো পথে হাঁটছি, অন্যদিকে বেতার এখনও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্যতম প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। ইন্টারনেট ভিত্তিক অনলাইন রেডিও ফর্মেও বাংলাদেশ বেতারসহ অন্য মিডিয়াগুলো কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর কেননা ইন্টারনেটের ব্যাপারটা বৈশ্বিক, ডিজিটাল প্রযুক্তির কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই (Schwab, । এই সন্ধিক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বেতারে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার গুরুত্ব, প্রক্রিয়া এবং করণীয় নির্ধারণ করা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, পিছু ফিরে তাকালে দেখা যায়– এটি কেবল একটি যন্ত্র নয় বরং ইতিহাসের সাক্ষী ও বর্তমানের সারথি। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া রেডিওর 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' উদ্বোধনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু হয় (হাবীব, ২০২২, পৃ. ১৩)। পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে ৫ কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটার নিয়ে সেই যাত্রা আজ 'বাংলাদেশ বেতার' নামে এক বিশাল মহীরুহে রূপ নিয়েছে। ঢাকার কেন্দ্র ছাড়াও সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা এএম ও এফএম কেন্দ্র মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার আজ ১৮ কোটি মানুষের হৃদস্পন্দনের সাথে মিশে আছে। শ্রোতাদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান, শিক্ষা দান এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে বিনোদন প্রদানই বাংলাদেশ বেতারের মূল অভিলক্ষ্য (বাংলাদেশ বেতার ওয়েবসাইট)। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেতার প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ বেতারের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে বেসরকারি এফএম রেডিও, কমিউনিটি রেডিও। আর বর্তমানে অনলাইন সম্প্রচারে বেতার জগতে এসেছে নতুনত্ব, অভিনবত্ব। বাংলাদেশের ইতিহাসে বেতারের সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়টি হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা। ২৬শে মার্চ কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে যে প্রতিরোধ যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা-ই এক পর্যায়ে জনযুদ্ধের 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এম আর আখতার মুকুলের 'চরমপত্র' ছিল এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র, যা শত্রুর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল (আখতার মুকুল, ২০০৪)। 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'র মতো গানগুলো ছিল এক একটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী। অবরুদ্ধ দেশবাসীর কাছে সেই রেডিও-ই ছিল এক টুকরো 'মুক্ত বাংলাদেশ'। কারো কারো মতে, সেই কঠিন সময়ে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' ছিল একটি 'ছায়া সরকার'– যা অবরুদ্ধ জনপদে আশার আলো হয়ে জ্বলত এবং বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখত (রহমান, ২০১৬)।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এই বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করিয়ে দেয়

যে, বেতার সবসময়ই গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার ধারক। আর সেই চেতনাকে বুকে নিয়েই আজ বেতার জগৎ দাঁড়িয়ে আছে প্রযুক্তির এক নতুন মোড়ে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়ে উঠেছে সময়ের অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

প্রশ্ন হলো, কেন এই প্রতিপাদ্য 'রেডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি উপকরণ; কণ্ঠস্বর নয়'। বাংলাদেশের জন্য গুরুত্ব বহন করে? আমরা জানি, বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এই বেতার যা সময়কে ধারণ করে চলে। বেতার বৈজ্ঞানিক জগতের নবতম সৃষ্টি (দাশ ও দাস, ২০১১, পৃ. ৬৭)। জেনারেটিভ এআই (যেমন- ChatGPT, Gemini) এখন আর কল্পবিজ্ঞান নয়। বেতারের নিয়মিত কাজ, যেমন– অনুষ্ঠানসূচি তৈরি, আবহাওয়ার আপডেট, খেলার খবর প্রস্তুত করাসহ অন্যান্য বিষয় এখন এআই-এর মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্প্রচার জগতে এআই ইতোমধ্যে খেলার খবর ও আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে (Jia, 2022)। এতে সম্প্রচারকরা আরও সৃজনশীল কাজে, যেমন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা শ্রোতাদের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনে বেশি সময় দিতে পারবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেখানে অনেক বেতার কেন্দ্র সীমিত জনবল ও সময়ের চাপে কাজ করে, সেখানে এআই বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে (বিএনএনআরসি, ২০২৬)। এর ফলে সম্প্রচারকরা আরও সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন, যেমন- অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি, সম্প্রদায়ের গভীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা বা শ্রোতাদের সঙ্গে আরও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এর বাইরেও, এআই-এর আরও কিছু শক্তিশালী দিক রয়েছে। এটি বিশাল আকারের অডিও আর্কাইভকে সহজেই ডিজিটালাইজ ও সংরক্ষণ করতে পারে। ট্রান্সক্রিপশন ও মেটাডেটা তৈরির মাধ্যমে পুরানো অমূল্য অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার বা সংগীতকে নতুন করে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এআই অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে (বিএনএনআরসি, ২০২৬)। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাও দূর করতে পারে এটি। স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ টুল ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবার্তা বা কৃষি তথ্য বিভিন্ন উপভাষায় অনুবাদ করে সম্প্রচার করা সম্ভব (Rahman, 2025)। রিয়েল-টাইম অনুবাদের মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠান বিভিন্ন ভাষায় একই সঙ্গে সম্প্রচার করা সম্ভব, যা বহুভাষিক দেশ যেমন বাংলাদেশের মতো দেশে বেতারের পরিধি আরও বাড়িয়ে দেবে। পাশাপাশি, ব্যক্তির পছন্দভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রচার নিশ্চিত করতে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এআই-চালিত অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে শ্রোতাদের পছন্দ-অপছন্দ বিশ্লেষণ করে তাদের জন্য বিশেষায়িত অনুষ্ঠান তৈরি করা সম্ভব। এমনকি সংবাদের সত্যতা যাচাই এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিতেও এটি সহায়ক হতে পারে (Jia, 2022)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এআই-এর এই সংযোজন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বের দাবিদার। ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা ক্ষেত্রে, যেমন– ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা (চাকমা, মারমা, সাঁওতালি) ও আঞ্চলিক উপভাষায় তথ্য পৌঁছে দিতে এআই-চালিত অনুবাদ ও ভয়েস সিন্থেসিস প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব। সম্প্রতি ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় উচ্চমানের তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন (তানভী, ২০২৫)। দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশ; দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়লে বেতারই তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, তাই এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা ব্যবস্থা বেতারের সাথে যুক্ত করে দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য প্রাণরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আরো বলা যায়, ইন্টারনেটের ধীরগতি বা সংযোগহীন প্রান্তিক এলাকায় বেতার এখনও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এআই-এর সাহায্যে তৈরি স্বল্প-ব্যান্ডউইথ-বান্ধব কনটেন্ট বেতারের মাধ্যমে সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায়, যা ডিজিটাল বিভাজন কমাতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি, তথ্যের সত্যতা যাচাই জরুরি, গুজব ও ভুয়া তথ্যের এই যুগে বেতার একটি বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসেবে এআই-চালিত ফ্যাক্ট-চেকিং টুল ব্যবহার করে সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে পারে এবং শ্রোতাদের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দিতে পারে (Jia, 2022)।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, মানবিক আবেদন নাকি অ্যালগরিদম, বেতার কোন পথে হাঁটবে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সকল সম্ভাবনার পাশাপাশি একটি গভীর উদ্বেগও কাজ করে। এই উদ্বেগের মূলে রয়েছে বেতারের আসল সত্তা, 'মানবিকতা'। বেতার কেবল খবর বা তথ্য পরিবেশন করে না; এটি এক অনুভূতির নাম, এক বিশ্বস্ততার নাম। বেতারের শক্তি হলো বাচিক, অনুভূতির সম্পৃক্ততা, চিন্তার সাথে কল্পনা ও বাস্তবের সংযোগ। আর এই সংযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মানুষ, মানবকণ্ঠ। ২০২৬ সালের প্রতিপাদ্যটি স্পষ্ট করেই বলছে, এআই একটি উপকরণ মাত্র, কণ্ঠস্বর নয় (UNESCO, 2026)। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, এর নিজস্ব কোনো নৈতিক বোধ, সাংস্কৃতিক সচেতনতা বা সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষমতা নেই। একজন উপস্থাপক কিংবা আরজে-র কণ্ঠে থাকা সহমর্মিতা, একটি খবর পাঠকের পাঠে থাকা আস্থা, কিংবা একজন সংবাদ বিশ্লেষকের বক্তব্যে থাকা নৈতিক দায়িত্ব– এগুলো কখনো কি অ্যালগরিদম দিয়ে তৈরি করা সম্ভব? বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এআই সিস্টেম যদি বিশ্বব্যাপী তথ্যভাণ্ডারে প্রশিক্ষিত হয়, তবে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে স্থানীয় ভাষার সূক্ষ্মতা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট হারিয়ে ফেলতে পারে (তানভী, ২০২৫)।

বাংলাদেশে এআই প্রযুক্তি গ্রহণের পথে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন– উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি এবং বাংলা ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত 'ডেটা সেট' বা তথ্যভাণ্ডারের অভাব (টেকটকস বাংলা, ২০২৫)। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে এআই-এর অপব্যবহার রোধে একটি সমন্বিত আইনি কাঠামো তৈরি করা জরুরি। সম্প্রতি 'জাতীয় এআই নীতিমালা (২০২৬-২০৩০)'-এর খসড়া প্রকাশিত হয়েছে (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ২০২৬) এবং এটুআই বাংলাদেশ নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্পন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রস্তুতি মূল্যায়ন (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রেডিনেস অ্যাসেসমেন্ট-র‍্যাম) প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে (এটুআই বাংলাদেশ, ২০২৫)।

নীতিমালায় ডিপফেক (Deepfakes), এআই-সৃষ্ট গুজব বা অপতথ্য মোকাবিলায় ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বিএম মইনুল হোসেন মনে করেন, জেনারেটিভ এআই আসার পর যে কারো কণ্ঠ, চেহারা নকল করা হচ্ছে। এটা শুধু আমাদের দেশের জন্যই না বরং সারা বিশ্বের জন্যই এটা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৫)। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বেতার সম্প্রচারে প্রয়োজন–

নীতিগত স্পষ্টতা: জাতীয় এআই নীতিমালা প্রণয়ন দ্রুত শেষ করা। এই নীতিমালায় বেতার সম্প্রচারকে অগ্রাধিকার দিয়ে এআই-নির্মিত কনটেন্ট চিহ্নিতকরণ বাধ্যতামূলক করা (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ২০২৬)।

কণ্ঠশিল্পের মর্যাদা রক্ষা: খেলার খবর বা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো রুটিন কাজ এআই-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় করে দিলেও সংবাদ, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ তথ্যের ক্ষেত্রে মানব সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক রাখা (Rahman, 2025b)।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি রেডিওর সম্প্রচারকদের জন্য এআই প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে চালু করা। উল্লেখ্য, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিটিউটে বিভিন্ন পাঠ্যধারায় এআই-এর গুরুত্ব সংযোজন করা হয়েছে (হাবীব, ২০২২)।

বাংলা ভাষাভিত্তিক ডেটা তৈরি: সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি খাত মিলে বাংলা ভাষার স্পিচ কর্পাস ও টেক্সট কর্পাস তৈরি করতে উদ্যোগ নেওয়া (টেকটকস বাংলা, ২০২৫)।

আইনি কাঠামো: এআই-নির্মিত কনটেন্টের কপিরাইট, ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করা (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ২০২৬)।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার পথে বাংলাদেশ বেতার সবসময় জনগণের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। পাশাপাশি রয়েছে বেসরকারি এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিওর কার্যক্রম। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের অতীত, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দেব। মনে রাখতে হবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যাত্রা শুরু হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক থেকেই। এটি একটি উপকরণ, আমাদের কল্পনার প্রতিচ্ছবি। আর এই প্রতিচ্ছবিকে যখন আমরা বেতারের মতো একটি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করছি, তখন আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। ২০২৬-এর এই সন্ধিক্ষণে এ বছরের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমাদের অঙ্গীকার হতে পারে– সুর হবে বাঙালির, ভাষা হবে বাংলার, আর হাতিয়ার বা উপকরণ হবে এআই; তবে কণ্ঠস্বর থাকবে সর্বদা মানুষের। কারণ, প্রযুক্তি বদলাবে, সময় বদলাবে, কিন্তু যন্ত্রের অনুভূতি কি পারবে মানুষের কণ্ঠের আবেদনকে ছাড়িয়ে যেতে?

তথ্যসূত্র

- আখতার মুকুল, এম. আর. (২০০৪)। *চরমপত্র* (২য় সংস্করণ)। প্রথমা প্রকাশন।
- এটুআই বাংলাদেশ। (২০২৫, নভেম্বর ২০)। প্রথমবারের মতো জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রস্তুতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ [প্রেস বিজ্ঞপ্তি]। *প্রথম আলো*।
- বাংলাদেশ বেতার। (২০১৫)। বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের ইতিহাস। বাংলাদেশ বেতার।
- বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন [বিএনএনআরসি]। (২০২৬)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বেতার: বাংলাদেশের সম্ভাবনা [নীতিমালা ব্রিফ]।
- ভট্টাচার্য, অ. (২০২৫, জুলাই ১৬)। চাকরির বাজারে এআই বিকল্প নাকি সহযোগী। সমকাল।
- দাশ, ভ., ও দাস, প. (২০১১)। কলকাতা বেতার (১৯২৭-১৯৭৭) (পৃ. ৬৭)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (২০২৫)। বর্ষপঞ্জি ও প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫। *তথ্যপ্রযুক্তি ইন্সটিটিউট*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- হাবীব, দে. ম. আ. (২০২২)। সম্প্রচারের ধারণাগত বিবর্তন। জাতীয় *গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট জার্নাল*, ৫ (৫), ১১-৩৯।
- Jia, Z. (2022). Analysis methods for the planning and dissemination mode of radio and television assisted by artificial intelligence technology. Wiley Online Library.
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৬)। জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতিমালা (২০২৬-২০৩০)- খসড়া (প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট, তথ্য বিবরণী, নম্বর: ২৩৬৭)।
- Rahman, A. B. (2025a, August 29). Exploring the future of community broadcasting in South Asia: Can AI enhance, but not replace? [Status update]. LinkedIn.
- Rahman, A. B. (2025b, August 2). Community radio broadcasting in digital development around the world: Challenges and way forward [Status update]. LinkedIn.
- রহমান, ড. ম. (২০১৬)। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র: ছায়া সরকারের মুখপাত্র। [প্রকাশকের নাম অজানা]।
- Schwab, K. (2016, January 14). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum.
- তানভী, জে. (২০২৫, অক্টোবর ৮)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত? BBC News বাংলা।
- টেকটকস বাংলা। (২০২৫, জুলাই ১২)। বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আশাব্যঞ্জক বিস্তার: বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ। টেকটকস বাংলা।
- UNESCO. (2011, November). Proclamation of World Radio Day (36 C/Resolution 63). Records of the 36th Session of the General Conference.
- UNESCO. (2026). World Radio Day 2026: Radio and Artificial Intelligence.

তানিয়া খান: আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ সালে ঢাকায় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কর্মীরা

ভাষার অধিকার, মাতৃভাষা চর্চা ও চৈতন্য

জাকির আবু জাফর

স্রষ্টার তরফ থেকে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো উপহারের অন্যতম হলো ভাষা। এ উপহার কেবল মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রাণী, কোনো উদ্ভিদ বা কোনো পশুকে দেওয়া হয়নি। ভাষার এ গুণই মানুষকে পশু ও অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রাণী থেকে মানুষ যে কয়টি গুণে শ্রেষ্ঠ ভাষা তার অন্যতম। ভাষার মাধ্যমেই মনের ভাব বিনিময় করে মানুষ। নিজেকে প্রকাশ করে। নিজের চাহিদার কথা ব্যক্ত করে। নিজের গোপন প্রকাশ্য সবই ব্যক্ত করে।

ভাষার মাধ্যমেই মানুষ অধিকারের কথা বলে। স্বপ্নের কথা বলে। সম্ভাবনার কথা বলে। নতুন কল্পনা কিংবা পরিকল্পনার কথা। বলে ইতিহাসের কথা, ভূগোলের কথা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। ঘটে যাওয়া যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অতীত জীবনের কথা বলে অনাগত দিন অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা। মানুষ তার প্রিয়জনের কথা বলে। প্রিয়মুখের কথা বলে। বন্ধু এবং শত্রুর কথা বলে। এভাবে বলে বলেই মানুষ বুঝেছে জীবনের প্রয়োজন। বুঝেছে জীবনের আয়োজন। বুঝেছে ভয় ও সাহসের সীমানা। জেনেছে আকাশ থেকে পাতাল অবধি সকল কিছু ব্যক্ত করার মাধ্যম।

তবে মজার বিষয় হচ্ছে– জগতের সকল কিছুর ভাষা আছে। সকল প্রাণীর ভাষা আছে। সকল উদ্ভিদের ভাষা আছে। এমনকি প্রাণহীন জড় পদার্থেরও ভাষা আছে।

মানুষের ভাষা সশব্দ। আর অন্য সৃষ্টির ভাষা নিঃশব্দ। মানুষ মানুষের ভাষায় কথা বলে। প্রাণীরা কথা বলে প্রাণীদের ভাষায়। মানুষের ভাষা সশব্দ অর্থাৎ শব্দের মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করে মানুষ। এ শব্দ হয় মাতৃভাষার নয় তো অন্য কোনো বিদেশি ভাষার।

কিন্তু প্রাণীদের বিদেশি ভাষা নেই। প্রাণীরা নিজেদের প্রকাশ করে তাদের নির্দিষ্ট ইঙ্গিতে। এটি বোঝা যায়- প্রাণীরা বিপদে পড়লে একধরনের ইঙ্গিত দেয়। তখন তাদের চেহারায়ও উদ্বিগ্ন অবস্থার প্রকাশ ঘটে। আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থাকলে সেটিও বোঝা যায়।

মানুষের ভাষা প্রয়োগের বিষয়টি সত্যি অবাক করার মতো। প্রশ্ন জাগে– মানুষের মুখে কি যন্ত্র লাগানো যে মানুষ শব্দ উচ্চারণ করে! শুধু কি উচ্চারণ! না, বরং মধুর উচ্চারণ! সুরে আনন্দে আহ্লাদে উচ্চারণ!

মানুষ তার অনুভূতির কথা বলে। অনুভবের কথা বলে। বোধ ও বিশ্বাসের কথা বলে। আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে। দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, জন্মমৃত্যুর কথা বলে। এমনকি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথাও বলে। এভাবেই মানুষ মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সমন্বয় করে। সংযোগ স্থাপন করে। পরস্পরের নিকটে থাকে এবং রাখে।

বলছিলাম- মানুষের ভাষা সশব্দ। সশব্দ ভাষা থাকার অর্থই হলো— নিঃশব্দ ভাষাও রয়েছে। সশব্দ অর্থাৎ শব্দ আছে। বর্ণ আছে। বাক্য আছে। মানুষের এ ভাষা যেমন বলা যায়। তেমনই লেখা যায়। তেমনই পাঠও করা যায়। এই বলা, লেখা এবং পাঠের সমন্বয়ে মানুষের ভাষার জীবন। ভাষার এ জীবন যার যত উন্নত তিনি ততটাই শিল্পীত। ভাষার সৌন্দর্য মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। ভাষা ব্যবহারে বোঝা যায় মানুষের ব্যক্তিত্বের ধার। মানুষের চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা। কেননা, যার ভাষা উন্নত, তার চিন্তাও উন্নত। উন্নত চিন্তাকে বহন কিংবা ধারণ করার জন্য উন্নত ভাষা দরকার।

শব্দরা পরস্পর বসে যখন কোনো অর্থ প্রকাশ করে সেটি হয় বাক্য। এই শব্দ এবং বাক্য মিলেই ভাষা প্রকাশ্য হয়। এটিই সশব্দ ভাষা।

এখন আমরা দেখব নিঃশব্দ ভাষার ভাণ্ডার। পৃথিবীর সকল প্রাণীর ভাষা আছে। সকল উদ্ভিদের ভাষা আছে। এমনকি প্রতিটি বস্তুরও আছে ভাষা।

প্রথমত এই ভাষা থাকে প্রতিটি প্রাণী উদ্ভিদ এবং বস্তুর অবয়ব বা আকারের মধ্যে। এটিকে আমরা শারীরিক ভাষাও বলতে পারি।

একটি বৃক্ষকে দেখেই আমরা বলি- এটি বৃক্ষ। কি বৃক্ষ? ধরুন হিজল, কিংবা কাঁঠাল বৃক্ষ। তো গাছটিকে দেখেই আমরা বলি- এটি কাঁঠাল গাছ। এটি হিজল গাছ। গাছের ডাল দেখে বলি- এটি ডাল। পাতা দেখেই বলে উঠি- এটি পাতা। এমনি করে ফুল-ফল-কাণ্ড প্রতিটি অঙ্গ দেখেই আমরা নাম বলে দেই।

আবার জড়বস্তুর ক্ষেত্রেও একই কথা। টেবিল, চেয়ার, খাট, আলনা, আয়না, আলমারি এ সবই দেখা মাত্র তার অবয়বে মিশে থাকা ভাষায় ভেসে ওঠে মানুষের চোখে। মানুষ দেখা মাত্রই বলতে পারে এসবের কোনটি কি। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি কবিতার নাম– 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। এ কবিতায় কবি বলেছেন– তোমার পাতায় দেখেছি তাহারই আঁখির কাজল লেখা / তোমার দেহের মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।/ তব ঝিরঝির মিরমির যেনো তারই কুণ্ঠিত বাণী/ তোমার শাখায় ঝোলানো তারির শাড়ির আঁচল খানি। এখানে কবি তার প্রেয়স-প্রেয়সীর সৌন্দর্য একটি বৃক্ষের সৌন্দর্যের সাথে জড়িয়ে দেখেছেন। এটিও একটি ভাষা।

ঢাকার প্রথম শহিদমিনার

আমরা আকাশের দিকে ফিরেই বলি ওটি আকাশ। মেঘ দেখেই বলি- ওটি মেঘ। আবার কালো মেঘ, ধলো মেঘ, ধূসর মেঘ কিংবা রাঙা মেঘ তাদের সকলেরই শারীরিক ভাষা প্রকাশিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— মানবজীবনে ভাষার অধিকার কি! কোন ভাষা রপ্ত করতে হবে। কোন উন্নত ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে!

ভাষা প্রতিটি মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার জন্মগতভাবেই। এই অধিকার সংরক্ষণ করেই পৃথিবীতে আসে মানুষ। একটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর কান্না জুড়ে দেয়। এ কান্নাই তার ভাষা। একইসাথে পৃথিবীতে এসেই এ কান্নাটি তার অধিকার। তাকে কাঁদতে হয়। না কাঁদলে কাঁদাতে হয়। যেন তাকে বলা হয়– তুমি পৃথিবীতে এসেছ, তোমাকে কাঁদতে হবে। এটি তোমার অধিকার। তোমার প্রথম ভাষা হলো কান্না। তুমি নিজে এ অধিকার না নিলে, আমরা বুঝিয়ে দেবো তোমার অধিকার!

অর্থাৎ একটি নবজাতকের জন্য এই কান্না একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা! শিশুটি ভাষার এ অধিকার প্রয়োগ না করলে উদ্বিগ্ন হন বাবা-মা ডাক্তার! তখন তাকে কিছুটা কষ্ট দিয়ে হলেও ভাষার অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

মজার এবং বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে– পৃথিবীর সকল মানুষের কান্না-হাসির ভাষা এক। আনন্দ-বেদনার ভাষা এক। সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং প্রকাশও এক। এটি সকল জাতির সকল ভাষার সকল মানুষের ক্ষেত্রে একই।

সুতরাং ভাষার এ অধিকার জগতের সকল মানুষের রয়েছে। এই অধিকার মানুষকে স্বয়ং স্রষ্টা দিয়েছেন। এই বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অন্য কিংবা ভিন্ন মতও নেই। অর্থাৎ মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে যতগুলো অধিকার নিয়ে ভাষা সেই অধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য অধিকার।

জন্মগত এমন অধিকার আরও আছে। যেমন বেঁচে থাকার অধিকার! স্বাধীনতার অধিকার। দেশের নাগরিকত্বের অধিকার। শ্বাস-প্রশ্বাসের অধিকার।

বসবাসের অধিকার। ভাত-কাপড়ের অধিকার। ঠান্ডা-গরমের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার। লেখাপড়ার অধিকার! স্বাস্থ্য চিকিৎসার অধিকার। নিরাপত্তার অধিকার। এইরকম আরও অধিকার রয়েছে! যা মানুষ জন্মগতভাবে পেয়ে যায় বা অধিকার নিয়েই জন্মায়। এর মধ্যে ভাষার অধিকারটি গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু কখনও কখনও মানুষেরা মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। কেড়ে নেয়ও। এমন উদাহরণের অভাব তো নেই। পৃথিবীতে এমন বহু শাসক আছে, যারা তাদের দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করে। দেশে দেশে এমন শাসকের অভাব নেই এখন। মানুষ মানুষের জন্মগত অধিকার কেড়ে নেয়, নিতে পারে এটি ভাবা যায় না। শাসক সেজে বসে স্বৈরাচার। এসব স্বৈরাচার মানুষকে নিপীড়ন করে। নির্যাতন করে। নিষ্পেষণে জর্জরিত করে। প্রতিবাদ করতে গেলে নির্যাতন হয় আরও বেশি।

আমরা আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরি। একসময় পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি আমাদের মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। আমরা মানিনি।

প্রতিবাদ করেছি আগুনঝরা। রক্ত দিয়েছি। জীবন দিয়েছি। তবুও রক্ষা করেছি মাতৃভাষার সম্মান। তারই ধারাবাহিকতায় এসেছিল অগ্নিবৎ সময় একাত্তর। আমরা এক সাগর রক্ত দিয়েছি। লক্ষ শহিদের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু স্বাধীনতার সুফল পেলো না এই জনপদের মানুষ। দুর্বল শাসন এবং দুর্বৃত্তের শাসন, স্বৈরাচারী শাসন সব শাসনই আমাদের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। প্রবলভাবে এলো নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন। বিদায় হলো স্বৈরাচার। কিন্তু নব্য স্বৈরাচারের জন্ম হতেই থাকে। সেই স্বৈরাচার তাড়াতে এলো জুলাই বিপ্লব। কিন্তু আমাদের ভাষাবিপ্লবের স্থান কোথাও হয়নি। কোনো সরকারই ভাষার গৌরব ধারণ করেনি। ভাষার সৌন্দর্য লালন করেনি। ভাষা উন্নতির কাজ তেমন করে করেনি। যা হয়েছে তার সবই একটি রুটিন কাজ।

এই জনপদে সাহসের পদচিহ্ন আঁকা হয়েছে বহুবার। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ইতিহাস। শাসক এসেছে, গেছে। শাসকের বদল হয়েছে। কিন্তু জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি।

আমরা জন্মেছি এই ভাটি অঞ্চলে। এই ভাটি বাংলায়। এখানে পাখির কুজনে সুর বাজে সংগীতের। এখানে ভোরের লালিমা আমাদের অন্তর আলোড়িত করে। নিঝুম দুপুরে ঘুঘুর গানে আনমনা হই আমরা। এসবই আমাদের ভাষার আনন্দে উদ্‌যাপন করি আমরা।

আমাদের জন্মগত ভাষা যাকে আমরা মাতৃভাষা বলি, তা হলো বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় কথা বলেন, আমাদের মায়েরা। আমাদের দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং তাদের পূর্বপুরুষও এই ভাষায় কথা বলতেন। যে কারণে আমাদের মাতৃভাষা হলো বাংলা। মাতৃভাষার প্রতি এক ধরনের গভীর ভালোবাসা থাকে সকলের। দুনিয়ার সকল জাতির লোকদের কাছেই তার মাতৃভাষা ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া মানুষ কেমন করে কথা বলবে! কেমন করে স্বপ্ন দেখবে! কেমন করে মনের ভাব প্রকাশ করবে! পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ যে ভাষার জনপদে বসত করুন না কেন, তিনি স্বপ্ন দেখেন তার মাতৃভাষায়।

এমন পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় কি, যে পৃথিবীতে কোনো ভাষা নেই। কিংবা থাকবে না! কেউ কথা বলবে না বা বলতে পারবে না! যদি সত্যিই ভাষা না থাকত তবে কি হতো! ভাষাহীন তেমন বোবা সময়ের কথা কি ভাবা যায়! নাকি কল্পনা করা যায়! তেমন পরিস্থিতি কল্পনা করলে দম বন্ধ হয়ে আসে! ভাবলে ভয় লাগে। তখন মানুষও প্রাণীদের মতো কাঁইকুঁই কাঁইমাই কুকু অ্যাঁ আঁ করত শুধু। ভাষা না থাকলে মানুষের এত মর্যাদা এত সম্মান এত পদ-পদবি কি করে হতো! ভাষা না থাকলে কে প্রেসিডেন্ট, কে প্রধানমন্ত্রী, কে রাজা, কে প্রজা– কীভাবে প্রকাশ পেতো। আইনের দোহাই দিয়ে মানুষের অধিকার হরণের তামাশাও বন্ধ হয়ে যেতো।

ভাষার জন্যই এই মানুষ অন্য সব প্রাণীর ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে। ভাষা প্রয়োগেই একজন

রাজনীতিক তার দর্শন প্রকাশ করে। দেশ শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করে। সেই ভাষাই যদি না থাকত তো কি হতো!

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে বাহান্নর শাসকগোষ্ঠী অকারণ কাহিনি করেছে। অন্যায় এবং অন্যায্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কি কারণে উর্দু ভাষাটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। এটি করে কি লাভ হলো তাদের। বরং বিরাট ক্ষতি বহন করতে হয়েছে সেসব শাসকদের।

১৯৪৮ সালের দিকের কথা। সেই সময়কার শাসকগোষ্ঠী ঘোষণা করল– শুধু মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তান যেটি এখন আমাদের বাংলাদেশ, এখানকার বেশির ভাগ মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলত। উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তো বাংলা ভাষার মানুষ কি করবে! এমন চিন্তা থেকেই একসময় তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলা ভাষার পক্ষে। এই আন্দোলনের অগ্রপথিক সংগঠন হলো তমদ্দুন মজলিশ। আন্দোলন হতে হতে একসময় ভীষণ জোরালো হয়ে গেল আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলা ভাষাভাষীরা প্রতিবাদী মিছিল বের করে। পাকিস্তানি শাসকদের ইশারায় এই মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। এতে বরকত, সালাম, রফিকসহ প্রাণ দেন অনেকে। অনেকে চোখ, কান, হাত, পা হারান। চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায় বহু লোক। কিন্তু বাংলা ভাষার মর্যাদা ছিনিয়ে নিতে পারেনি তারা। আমাদের বাংলা ভাষা আমাদের থাকল। আমরা মাতৃভাষা পেলাম আমাদের করে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো জাতি এমন আর নেই যারা ভাষার জন্য লড়াই করেছে। ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছে। ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। না, নেই কোনো দেশে, কোনো ভাষায়, কোথাও কোনোখানে। আমরা সংগ্রাম করেছি, লড়াই করেছি, জীবন দিয়েছি অর্থাৎ আমার ভাই শহিদ হয়েছে এ ভাষার জন্য। সে দিক থেকে কত না গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই মাতৃভাষা বাংলা।

কিন্তু আমরা কি সেই গুরুত্ব অনুভব করি! আমাদের রাষ্ট্র কি অনুভব করে! আমরা কি আমাদের ভাষার মান রক্ষা করতে পেরেছি! পেরেছি কি তেমন করে সম্মান দিতে! পারিনি। কিন্তু কেন পারিনি। কী অসুবিধা ছিল আমাদের! কেনো শহিদি ভাষা পেয়েও আমরা ভাষার মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারিনি!

অথচ আমরা তো স্লোগান দেই অতি উঁচু কণ্ঠে। স্লোগান দেই অনেক জোর গলায়। কিন্তু স্লোগানের আলোকে কখনও কাজ করার চিন্তা এবং চেষ্টা করেছি কি! কেন করিনি! কে বাধা দিলো আমাদের। কে আমাদের যাত্রাপথে কাঁটা দিয়েছে। নাকি আমরাই আমাদের কাঁটা হয়ে সৃষ্টি করেছি ভয়াবহ প্রতিবন্ধকতা!

সেই অর্থে আমরা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং উন্নতির জন্য যুগোপযোগী কোনো জোরালো পদক্ষেপই নেইনি। নিলেও সেটি দায়সারা গোছের। কিংবা তা থেকে গেছে পরিকল্পনার ভেতর!

আমাদের শিশুরা সহজে বাংলা শিখতে পারে কি? এই বাংলা বলতে বাংলা ভাষার জাতীয় রূপের কথা বলছি। আমরা কি সবাই আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারি?

পারি নাতো! তাহলে কি হলো ব্যাপারটি!

আমরা যে সংগ্রাম করলাম, জীবন দিলাম, পঙ্গু হলাম! তার কি ফল পেলাম! কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় উল্লেখ করতে হয়, আমাদের যারা উচ্চ শিক্ষিত লোক তারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে যেন লজ্জা বোধ করেন ।

এখানকার সুশীলদের ধারণা– বাংলা হলো ছোটো লোকদের বুলি বা কম শিক্ষিত লোকদের ভাষা। অতি শিক্ষিতদের ভাষা হলো ইংরেজি! সুশীলেরা যেহেতু বড়ো শিক্ষিত অতএব তাদের ভিনদেশি ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজিতে কথা বলতেই হবে। নইলে শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিতের মর্যাদা রক্ষা হবে কী করে! তাদের শিক্ষার সকল গৌরব ইংরেজি ভাষায় বসত করে! যদি ইংরেজি না বলেন তবে তো সব ধুলায় লুটিয়ে যাবে! জানতে সাধ জাগে– এরই জন্যে কি একুশে ফেব্রুয়ারির এতো বিশাল আন্দোলন হলো! এর জন্যে কি হলো এতো শহিদ! বিসর্জিত হলো এত প্রাণ!

আমরা প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি এলে কি চমকপ্রদ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে যাই। সাদাকালো পোশাক পরিধান করে প্রভাত ফেরিতে যাই। রাজপথে মিছিল করি। মধ্যরাতে শহিদমিনারে ফুলের ডালা বিছিয়ে শহিদের স্তবগান করি। অথচ একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি অতিবাহিত হলেই সব ভুলে থাকি।

অথচ আমাদের কি করা উচিৎ! কি করি আমরা! সারাটি বছর বাংলা ভাষার উন্নয়নের পক্ষে কাজ করা জরুরি নয় কি! আমরা কি তা করি! কেনো করি না এ প্রশ্ন আমাদের তুলতে হবে। শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, এর জন্য যথার্থ পদক্ষেপও নিতে হবে। আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করতে হবে। ভাষার শুদ্ধতা শেখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের শিশু-কিশোরদের মুখে তুলে দিতে হবে ভাষার শুদ্ধতা। কণ্ঠে দিতে হবে বাংলা ভাষার আনন্দময় উচ্চারণ!

এখন থেকেই সচেতন হতে হবে। এখন থেকে শিখতে হবে ভাষার জাতীয় রূপ। শুদ্ধ করে বলা এবং লেখার কোনও বিকল্প নেই। যদি আমরা সঠিকভাবে ভাষার সম্মান রক্ষা করতে পারি তবেই মর্যাদাবান হবে একুশে ফেব্রুয়ারি। তবে এখানে এ কথা দ্বিধাহীন বলা যায়– ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়টি সচেতনতার সাথে যদি না হয়, যদি সেটি সরকারি অর্থাৎ জাতীয়ভাবে না হয়, তবে ভাষার উন্নতি কখনও সম্ভব নয়!

জাকির আবু জাফর: কবি, ছড়াকার, সাহিত্য সম্পাদক, নয়াদিগন্ত

রক্তে রাঙা বর্ণমালা

মিয়াজান কবীর

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালেই গণআজাদী লীগ বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধরে। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে লিখেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ আরও অনেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেম এই সময় এগিয়ে আসেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসেই আবুল কাসেম ও অন্যান্যরা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। এতে শত শত ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু সরকার এতে গুরুত্ব দেয়নি। করাচিতে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটাই ছিল প্রথম সভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল কাসেম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার বাহন করার জন্য দাবি জানান। সভা শেষে ছাত্ররা মিছিল বের করেন।

১৯৪৭ সালেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ডিসেম্বর মাসের দিকে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন নুরুল হক ভুইয়া। সদস্য ছিলেন আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন আহমেদ, শওকত আলী প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে, পরিষদের সদস্যরা পরিষদে বক্তৃতা করতে পারবেন ইংরেজিতে আর উর্দুতে। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, বাংলাকেও গণপরিষদের কাজের ভাষা করতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বিরোধিতা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে পেতে চায়। এই খবর ঢাকায় এসে পৌঁছালে আগুনে যেন ঘি পড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা প্রতিবাদে ঝড় তোলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আবুল কাসেম। নঈমুদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে খাজা নাজিমুদ্দিনের নিন্দা করা হয় এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানানো হয়। এরপর ২রা মার্চ নতুন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদে আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। বিক্ষোভে মিছিলে আর 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে কেঁপে ওঠে রাজপথ। মিছিলের ওপর মুসলিম লীগের সন্ত্রাসীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে পুলিশের আক্রমণে অনেক ছাত্র আহত হন। অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান।

পুলিশের এই জুলুমের প্রতিবাদে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ছাত্র-ধর্মঘট চলতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাঁধ ভাঙা বিক্ষোভ দেখে ভয় পেয়ে যান। ফলে আপোশের জন্য সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তিনি। উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় বিনা শর্তে। বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষারূপে তিনি মেনে নেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাবেন বলে তিনি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথা রক্ষা করেননি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সফরে ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতায় বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহর বক্তৃতা শুনে ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে 'নো-নো' বলে প্রতিবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বক্তৃতাকালে একই কথা পুনরাবৃত্তি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা জিন্নাহর বক্তৃতায় তীব্র প্রতিবাদ করেন।

কালের খেয়ায় আসে ১৯৫২ সাল। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। পল্টন ময়দানে এক সভায় বলেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।’ সঙ্গে সঙ্গে আবার সারা ঢাকা শহরে আগুন জ্বলে ওঠে। চলতে থাকে বিক্ষোভ-সভা-সমাবেশ আর মিছিলের পর মিছিল। ছাত্ররা স্লোগান তোলেন, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।’ ৩০শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়।

৩১শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলের নেতাদের এক সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। গঠিত হয় ‘সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ’। কর্মপরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে সভা-বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল পালন করা হবে।

ভাষা সংগ্রাম কর্মপরিষদের পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি চলতে থাকে। মুসলিম লীগের নুরুল আমিন সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। অন্যদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলায় ছাত্ররা সভা করেন। এই সভায় অনেকেই বলেন, ১৪৪ ধারা ভাঙা ঠিক হবে না। কিন্তু আব্দুল মতিন, গাজিউল হক সিদ্ধান্ত নেন ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। ছাত্রদের আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে, গেটের বাইরের রাস্তায়, সশস্ত্র পুলিশ প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই অবস্থা দেখে ছাত্ররা গর্জে ওঠে, স্লোগান দিতে থাকে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।’ তারপর ছাত্ররা ছোটো ছোটো দলে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে ১৪৪ ধারা ভাঙতে রাস্তায় নেমে পড়েন। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করে তুললেন সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা। পুলিশ সংগ্রামী ছাত্রদের ওপর লাঠি চালায়। লাঠির আঘাতে অনেক ছাত্র লুটিয়ে পড়েন রাজপথে। ছাত্রীদের মাথায়ও পড়ে লাঠির আঘাত। নিরুপায় হয়ে ছাত্ররাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। চলতে থাকে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার খণ্ড যুদ্ধ। এক পর্যায় পুলিশ গুলি চালায় সংগ্রামী ছাত্রদের ওপর। পুলিশের গুলিতে রাজপথেই শহিদ হন রফিক উদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ও আব্দুল জব্বার শহিদ হন মেডিকেল কলেজের ভেতরে। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান, আব্দুল আওয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ। আহত হন অসংখ্য ছাত্র-জনতা। গণপরিষদে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাজপথে, গ্রামে-গঞ্জে বয়ে চলে প্রতিবাদের ঝড়। মুসলিম লীগ সরকার ঢাকায় জারি করে কারফিউ। আবুল বরকত যেখানে শহিদ হয়েছিলেন সেই জায়গায় ছাত্ররা ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে কারফিউয়ের মধ্যে গড়ে তোলেন শহিদমিনার। ভাষা আন্দোলন চলতে থাকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। অবশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অনেকে শহিদ হয়েছেন। অনেকে হয়েছিলেন আহত। ভাষা সংগ্রামীদের মধ্যে অনেকেই চলে গেছেন পরপারে। বাংলা ভাষার প্রতি ভাষা সংগ্রামীদের যে মমত্ববোধ, আত্মত্যাগ তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের সেই আত্মত্যাগের কথা জাতি কখনও ভুলবে না। ভাষা সংগ্রামীদের জীবনগাথা অত্যন্ত উজ্জ্বল। সেই আগুন ঝরা ফাগুন দিনের রক্তিম স্মৃতি জড়িয়ে আছে রক্তরাঙা শিমুল-পলাশ আর রক্তেরাঙা বর্ণমালার মাঝে। ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের জীবনালেখ্য বাংলা ভাষা এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক, miajankabir@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশে বইমেলা ২০২৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

গ্রন্থমেলার ইতিহাস এবং অমর একুশে বইমেলা

রহিম আব্দুর রহিম

ভাষা রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার ইতিহাস একমাত্র বাঙালি জাতিরই রয়েছে। ১৯৫২ সালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তস্নাত একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বীজতলা। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মানচিত্র, রক্তখচিত সবুজ পতাকা সবই একুশের পথ পেরিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক অর্জন। যে অর্জনের সূচিতে চুয়ান্নর সংগ্রাম, বাষট্টির আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন এবং একাত্তরের চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে পঙ্‌ক্তিমালা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত। সেই দিনগুলোর ইতিহাস খচিত বাঙালি জাতির জ্ঞানের সম্মিলন আজকের অমর একুশের বইমেলার উদ্ভবের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। বইমেলার চিন্তাটি এদেশে প্রথম মাথায় আসে প্রয়াত কথা সাহিত্যিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক সরদার জয়েন উদ্‌দীনের চিন্তায়। তিনি বাংলা একাডেমিতে একসময় চাকরি করেছেন। বাংলা একাডেমি থেকে ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পদে নিয়োগ পান। তিনি যখন বাংলা একাডেমিতে ছিলেন, তখন বাংলা একাডেমি প্রচুর বিদেশি বই সংগ্রহ করত। এর মধ্যে একটি বই ছিল , 'Wonderful world of books'. এই বইটি পড়তে গিয়ে তিনি হঠাৎ দুটি শব্দ দেখে পুলকিত হন। শব্দ দুটির একটি হলো– 'Book' অন্যটি 'Fair'। কত কিছুর মেলা হয়। কিন্তু বইয়ের যে মেলা হতে পারে এবং বইয়ের প্রচার-প্রসারের কাজে এই বইমেলা কতটা প্রয়োজনীয় সেটি তিনি এই বই পড়েই বুঝতে পারেন। ওই বইটি পড়ার পর, যখন তিনি ইউনেস্কোর শিশু-কিশোর গ্রন্থমেলা উন্নয়নের একটি প্রকল্পের কাজ করছিলেন। কাজ শেষ হবার পর তিনি ভাবছিলেন বিষয়গুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। পরক্ষণেই তিনি চিন্তা করেন প্রদর্শনীর চেয়ে একটি শিশু গ্রন্থমেলা করার কথা। যেই কথা সেই কাজ। আয়োজন করে ফেললেন 'শিশু গ্রন্থমেলা'। স্থান তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির নীচতলায়। এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা, যা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে।

'শিশু গ্রন্থমেলা' করেই সরদার জয়েন উদ্‌দীন পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারেননি। সুযোগ খুঁজতে থাকেন বড়ো আকারে 'বইমেলা' করার এবং সুযোগও পান। ১৯৭০ সালের নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জে একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। ওই মেলায় আলোচনাসভার ব্যবস্থাও করা হয়। যেসব আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই, শহিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও সরদার ফজলুল করিম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ওই মেলায় সরদার জয়েন উদ্‌দীন দর্শক কৌতূহলী এক রঙ্গ-তামাশার আয়োজন করেন। মেলার ভেতর একটি গরু বেঁধে রেখে তার গায়ে লিখে রাখেন 'আমি বই পড়ি না।' তার এই কৌতুকপূর্ণ ঘটনাটি পাঠকদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন।

সরদার জয়েন উদ্‌দীন এখানেই থেমে থাকেননি। ১৯৭২ সালে

তিনি যখন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক তখন ইউনেস্কো ওই বছরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। গ্রন্থমেলায় আগ্রহী সরদার সাহেব এই 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' উপলক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা'র আয়োজন করেন। সেই থেকে বাংলা একাডেমিতে বইমেলার সূচনা। এরপর ১৯৭২ সাল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানে কোনো বইমেলা হয়নি। তবে বাংলা একাডেমির দেওয়ালের বাইরে স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনীর কিছু বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেন। তাঁর দেখাদেখি মুক্তধারার প্রকাশনীর চিত্তরঞ্জন সাহা এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলামও ওভাবেই তাঁদের বই নিয়ে বসে যান। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে একটি বিশাল জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সরকারপ্রধান এই মেলার উদ্বোধন করেন। সে উপলক্ষ্যে নিজামী, চিত্তবাবু এবং বর্ণমিছিলসহ সাত-আটজন প্রকাশক একাডেমির ভেতরের পূর্বদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বই সাজিয়ে বসে যান। সেই বছরই প্রথম বাংলা একাডেমি বইয়ের বিক্রয় কেন্দ্রের বাইরে একটি স্টলে বই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই বিচ্ছিন্ন বই বিক্রির উদ্যোগের ফলেই বাংলা একাডেমিতে একটি বইমেলা আয়োজনের জন্য গ্রন্থ-মনস্ক মানুষের চাপ বাড়তে থাকে। ১৯৮৩ সালে কাজী মনজুরে মওলা যখন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, তখন তিনি বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু ওই সময় এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষাভবনের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে ট্রাক তুলে দিলে দুইজন ছাত্র নিহত হয়। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সেই বছর আর বইমেলা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সালে সাড়ম্বরে বর্তমানের 'অমর একুশে গ্রন্থমেলার' সূচনা হয়। এরপর প্রতিবছর বইমেলা বিশাল থেকে বিশালতর আকার ধারণ করে। মেলা উপলক্ষ্যে বিপুল বই প্রকাশিত হয়। বলা চলে, এই মেলা উপলক্ষ্য করেই বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গেছে। এখন অনেক নতুন প্রকাশক এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। পাঠকের সংখ্যাও প্রতিবছর বাড়ছেই। এই মেলা এক মাস ধরে চলে। পৃথিবীতে আর কোনো বইমেলা এতদিন ধরে চলে না। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এটি পৃথিবীর দীর্ঘদিনব্যাপী আয়োজিত একটি বইমেলা। এই মেলায় মানুষের আগ্রহ এতই বেশি যে, শুধু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে নয়; বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকেই গ্রন্থপ্রেমী বাঙালিরা এতে অংশ নেয়।

'বহুমাত্রিক বাংলাদেশ'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের মেলা উদ্বোধন হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে। মেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশে বইমেলা ২০২৬-এর উদ্বোধন করেন- পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশে বইমেলা ২০২৬-এর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন– পিআইডি

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সমৃদ্ধি ও সম্মানের সঙ্গে টিকে থাকতে হলে জ্ঞান এবং মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। এজন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মেধায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ হতে হবে। জনগণের প্রতি জবাবদিহিমূলক এ সরকার দেশটাকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে চায়।' তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, 'বইমেলা কেবল বই বেচাকেনার উৎসব নয়। এটি জাতির মেধা ও মননের প্রতীক।' তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'এ মেলা জাতিকে আরও বইপ্রেমী করে তুলবে এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।' জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সূতিকাগার হিসেবে বইমেলা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৭৮ সালে চালু হওয়া অমর একুশে বইমেলা এখন জাতির মেধা-মননের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির শুরুতেই মেলা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে এ বছর মেলা শুরু হয়েছে।' তিনি বইমেলা প্রসঙ্গে বলেন, 'বিশ্বের অনেক দেশেই বইমেলা হয়। তবে বাংলাদেশের বইমেলা ভিন্ন। যা মাতৃভাষার অধিকার আদায় ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের স্মারক।' বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরে এবং পাঠক সমাজের অনুপ্রেরণায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জার্মান দার্শনিক মারকুইস সিসেরোর একটি উক্তি 'বই ছাড়া ঘর আত্মা ছাড়া দেহের মতো' উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী গবেষণাগারের উদাহরণ টেনে বলেন, 'গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত বই পড়া মস্তিষ্কের কোষে নতুন সংযোগ তৈরি করে। স্মৃতিশক্তি ও বিশ্লেষণিক ক্ষমতা বাড়ায় এবং আলঝেইমার ও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে।' তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, 'ইন্টারনেট আসক্তি তরুণ প্রজন্মকে বইবিমুখ করছে। যদিও ইন্টারনেটেও বই পড়া যায়, তবে দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের পর্দায় ডুবে থাকায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।' যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ইন্টারনেট আসক্তি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।' পাঠাভ্যাস নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক জরিপের তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের প্রকাশিত জরিপে ১০২টি দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা বই পড়ায় শীর্ষে রয়েছে। তালিকায় সর্বনিম্নে আফগানিস্তান। ওই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। বাংলাদেশের একজন মানুষ গড়ে তিনটি বই পড়েন এবং বছরে বই পড়ায় সময় ব্যয় করেন ৬২ ঘন্টা। যুক্তরাজ্য কিংবা কানাডার মতো অনেক উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, ইন্টারনেট ব্যবহারের আসক্তি পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলার তীব্র ঝুঁকি রয়েছে। সময়ের প্রেক্ষিতে জনজীবনে ইন্টারনেট অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠলেও এর নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

বিশেষ করে বইয়ের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়াতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব আকারে বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, 'অমর একুশে বইমেলাকে অমর একুশে আন্তর্জাতিক বইমেলা হিসেবে আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ বাড়বে। বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী মাসব্যাপী আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনকে ইতিবাচক উদ্যোগ বলে প্রশংসা করেন এবং নতুন প্রজন্মের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে ভূমিকা রাখে বলে মন্তব্য করেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বইমেলা শুধু ফেব্রুয়ারিতে একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সীমাবদ্ধ না রেখে সারাবছর বিভাগ, জেলা, উপজেলায় আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকাশকদের উদ্যোগী ভূমিকার পাশাপাশি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগিতা দিবে বলে জানান তিনি। বাংলা একাডেমির গবেষণা বৃত্তি, তরুণ লেখক প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের মতো কার্যক্রমের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'এসব উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।' দেশের সাহিত্য, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের কার্যক্রম জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলা ও একুশে অনুষ্ঠানমালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বইমেলার উদ্বোধন ঘোষণার পরপরই সর্বসাধারণের জন্য মেলার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী-জুবাইদা রহমান ও কন্যা-ব্যারিস্টার জাইমা রহমানসহ মন্ত্রী সভার সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্মেলক কণ্ঠে জাতীয় সংগীত, পরে ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ শেষে সূচনা সংগীত, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি পরিবেশিত হয়। এরপর ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, এমপি। প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, এমপি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির

একুশে পদক ২০২৬ পেলেন যারা

অমর একুশে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি সংগীত ব্যান্ড দলকে 'একুশে পদক ২০২৬' প্রদান করা হয়েছে।

এ বছর একুশে পদক পেয়েছেন– চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য ফরিদা আক্তার ববিতা; চারুকলায় অধ্যাপক মো. আবদুস সাত্তার; স্থাপত্যে মেরিনা তাবাশ্যুম; সংগীতে আইয়ুব বাচ্চু (মরণোত্তর); নাট্যকলায় ইসলাম উদ্দিন পালাকার; সাংবাদিকতায় শফিক রেহমান; শিক্ষায় অধ্যাপক মাহবুবুল আলম মজুমদার; ভাস্কর্যে তেজস হালদার যশ এবং নৃত্যকলায় অর্থী আহমেদ। এছাড়া জনপ্রিয় ব্যান্ড 'ওয়ারফেজ' সংগীত দল হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

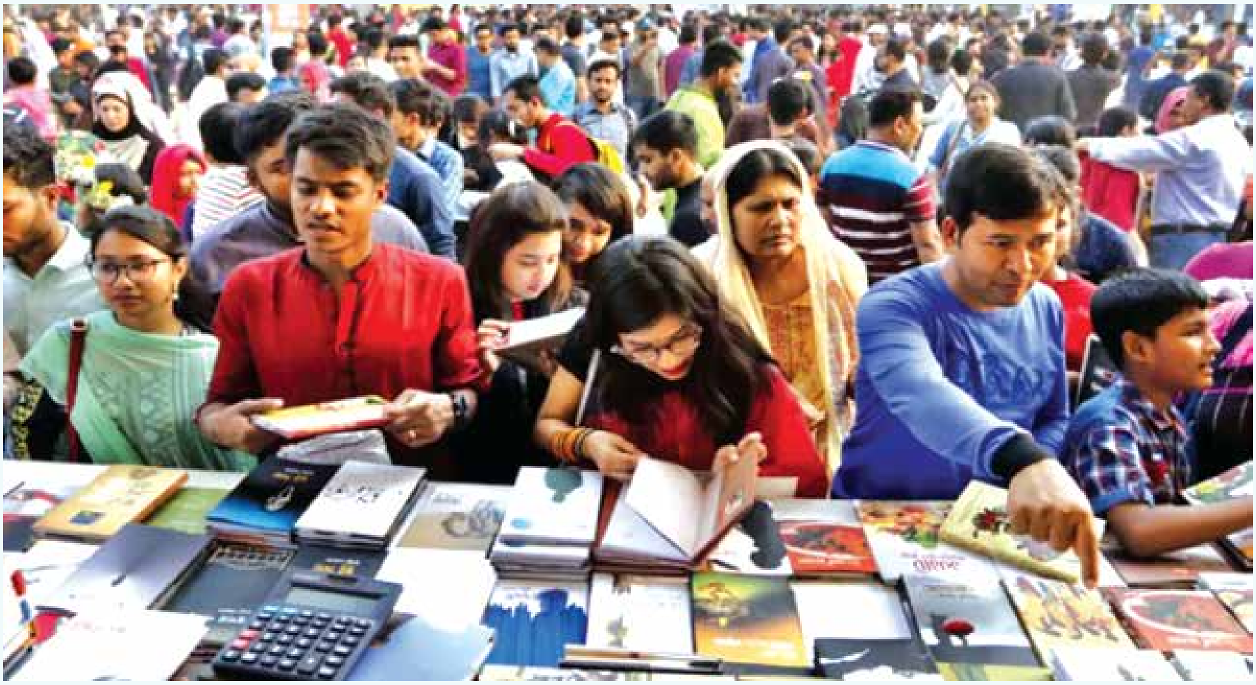

সভাপতি মো. রেজাউল করিম বাদশা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম।

এবার বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কথাসাহিত্যে- নাসিমা আনিস, প্রবন্ধ গদ্যে- সৈয়দ আজিজুল হক, শিশুসাহিত্যে- হাসান হাফিজ, অনুবাদে- আলী আহাম্মদ, গবেষণায়- মুস্তাফা মজিদ ও ইসরাইল খান। বিজ্ঞানে- ফারসীম মান্নান মোহাম্মাদী এবং মুক্তিযুদ্ধে- মঈদুল হাসান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রত্যেকের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অমর একুশে বইমেলা এবার ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা ছিল। এ বছর বইমেলায় মোট ৫৪৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। এরমধ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮১টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৪৬৮টি। এতে মোট ইউনিট ছিল এক হাজার আঠারোটি। এবারের বইমেলার আয়োজনকে পরিবেশ সুরক্ষা, সচেতন এবং ‘জিরোওয়েস্ট’ বইমেলায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বইমেলা পলিথিন ও ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়।

আজকের বইমেলাটি ২০১৪ খ্রি. থেকে ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অন্যতম এই মেলা ‘একুশে বইমেলা’ নামে বাংলা ভাষীদের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত। বর্ধমান হাউজ ঘিরে অনুষ্ঠিত মেলার পরিধি বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত গড়িয়েছে। যার পরিধি এগারো লাখ বর্গফুট। মায়ের সাথে যেমন সন্তানের নাড়ির সম্পর্ক; ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, শহিদমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং একুশে বইমেলা একই মায়ের সন্তান সমতুল্য। ভাষা আন্দোলনের চেতনায়ঋদ্ধ প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস একইসূত্রে গাঁথা। মা-মাটি-মানুষের বাঙালি জাতির আত্মতৃপ্তি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। যে ভাষায় জাতির সমষ্টিগত শিক্ষা, সাংস্কৃতির সূতিকাগার হিসেবে অমর একুশে বইমেলা হউক আমাদের চির পাথেয়।

রহিম আব্দুর রহিম: নাট্যকার, গবেষক ও জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩ ঘোষণা করেছে। পুরস্কারের জন্য ২৮ ক্যাটাগরিতে ৩০ চলচ্চিত্র, বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীকে নির্বাচন করা হয়েছে। ২৯শে জানুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আজীবন সম্মাননার জন্য চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ, চিত্রগ্রাহক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আব্দুল লতিফ বাচ্চুকে যুগ্মভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে কে. এম. হালিমুজ্জামান (খন্দকার সুমন)-এর *সাঁতাও*; শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র চৈত্রালী সমদ্দারের *মরিয়ম* এবং শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র এলিজা বিনতে এলাহী-এর *লীলাবতী নাগ: দ্য রেবেল* নির্বাচিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে আহাম্মেদ ফজলে রাব্বি আফরান নিশো (*সুড়ঙ্গ*), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে আইনুন নাহার পুতুল (*সাঁতাও*); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে মনির আহাম্মেদ (শাকিল) (*সুড়ঙ্গ*); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে নাজিয়া হক অর্ষা (*ওরা সাত জন*) নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খলচরিত্রে খন্দকার রশিদ আহমেদ (আশীষ খন্দকার) (*অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন*); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে শহীদুজ্জামান সেলিম (*সুড়ঙ্গ*); শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী মো. লিয়ন (*আম কাঁঠালের ছুটি*) এবং শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার আরিফ হাসান আনাইরা খান (*আম কাঁঠালের ছুটি*) পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন *সাঁতাও* চলচ্চিত্রের জন্য কে. এম. হালিমুজ্জামান (খন্দকার সুমন)। এছাড়া শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন (ইমন চৌধুরী) (*অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন*); শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক হাবিবুর রহমান (*লাল শাড়ি চলচ্চিত্র*), শ্রেষ্ঠ গায়ক কাজী মো. আলী জাহাঙ্গীর বালাম (*প্রিয়তমা*), শ্রেষ্ঠ গায়িকা অবন্তী দেব সিঁথি (*সুড়ঙ্গ*); শ্রেষ্ঠ গীতিকার মো. অলিউল্লাহ (সোমেশ্বর অলি) (*প্রিয়তমা*); শ্রেষ্ঠ সুরকার মুনির মাহমুদ প্রিন্স (প্রিন্স মাহমুদ) (*প্রিয়তমা*); শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার ফারুক হোসেন (*প্রিয়তমা*); শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার মো. নিয়ামুল হাসান (নিয়ামুল মুক্তা) (*রক্তজবা*) নির্বাচিত হয়েছেন।

সুড়ঙ্গ চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা হিসেবে রায়হান রাফী চৌধুরী (রায়হান রাফী) ও সৈয়দ নাজিম উদদৌলা যুগ্মভাবে মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে মো. সালাহ উদ্দিন আহমেদ বাবু (*ওরা সাত জন*), শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক শহীদুল ইসলাম (*সুড়ঙ্গ*); শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক সুমন কুমার সরকার (*চলচ্চিত্র*); শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক সুজন মাহমুদ (*সাঁতাও*); শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা বীথি আফরীন (*সুড়ঙ্গ*); শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান সবুজ (*প্রিয়তমা*) নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদন: ফয়সাল আহমেদ

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদমিনার

ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম

জামাল উদ্দিন

চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনের শুরু হয় ঢাকায় গোলাগুলির পর। তবে এর আগে ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে জে এম সেন হলে এ কে খানের সভাপতিত্বে সভায় এক মন্ত্রী বক্তব্য দিতে এলে সেখানে ভাষার ওপর লিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আবু তাহের, অনঙ্গ সেন, আরতি দত্ত। মন্ত্রীরা অবশ্য এ প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছেন। এর আগে ১৯৪৭ সালে ২৫শে আগস্ট আবুল ফজলের সভাপতিত্বে এক সভায় নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, হাবিবুল্লাহ বাহার, মোহন মিয়া, কমরেড মুজাফফর আহমেদ ভাষণ দেন। এগুলোতে ভাষার প্রশ্নে কোনো বক্তব্য ছিল না।

১৯৪৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দামপাড়া পুলিশ লাইনে ভাষণ দিতে এসে উর্দুর পক্ষে কথা বললেও তার প্রতিবাদ হয়েছে বলে জানা যায়নি। এ সভা পরিচালনা করেছিলেন আহমদ সগীর চৌধুরী। এ কে খান তাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। জিন্নাহ 'চট্টগ্রামকে সুন্দর নগরী করার প্রতিশ্রুতি' দিয়ে বাংলার স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য অত্যন্ত নির্বিঘ্নে দিয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে মন্ত্রী ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম কলেজে এসে আরবিতে বাংলা লেখার প্রস্তাব দিয়ে বক্তব্য রাখলে ছাত্ররা তাকে উদ্দেশ্য করে এক খোলা চিঠি দেয়। এ খোলা চিঠিতে বেশিরভাগ দাবিই ছিল ছাত্রদের শিক্ষা সম্পর্কিত। বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রীর সাথে গোলমালের দরুণ Force T.C. দেওয়া হয়েছিল ফরমানউল্লাহ খান ও শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইসহাককে। এ ঘটনার সাথে আরো জড়িত ছিলেন ড. মাহফুজুল হক, এজহারুল হক, আবদুল্লাহ আল হারুনসহ আরো অনেকে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের যে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব সোচ্চার ছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন জুলফিকার আলী, মওলানা আলতাফ হোসেন। এরা বাংলার বদলে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন, আরবি হরফে বাংলা চালুর পক্ষে জনমত সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন ও এ লক্ষ্যে '*হরফুল কোরান*' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এতে আরবি ভাষায় কীভাবে বাংলা লেখা যায়—তা বোঝানো হতো। অধ্যক্ষ রেজাউল করিমও আরবির পক্ষে ছিলেন।

১৯৫০ সালের পর থেকে চট্টগ্রামে 'তমদ্দুন মজলিসের' কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে বৈঠক করে বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলতে চেষ্টা করেন। তবে তা কর্মী-পর্যায়েই সীমিত ছিল। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের জন্য প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের দিনে চট্টগ্রামে একটা সর্বদলীয় কমিটি হয় মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন— এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, শেখ মোজাফফর আহমদ, সুচরিত চৌধুরী, এ কে এম আবদুল মান্নান, হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ, এম এ হক, আবদুস সাত্তার প্রমুখ। ঢাকায় গুলির সংবাদ আসার পরপরই চট্টগ্রামের স্কুল, কলেজ হতে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বের হয়। এসব মিছিলে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। নারীরাও মিছিল বের করে। খাস্তগীর গার্লস স্কুলের মেয়েরা দেয়াল টপকিয়ে এসে মিছিলে যোগ দেয়। চট্টগ্রামে সভা-মিছিল-ধর্মঘট শহর হতে গ্রামীণ পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ৫ই মার্চ পর্যন্ত তা চলে।

মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, মুসলিম হাই স্কুল, মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল, স্যার আশুতোষ কলেজসহ চট্টগ্রাম শহর ও গ্রামের প্রায় প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন থানা এলাকায় গুলি ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল, সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পর্যায়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলির সংবাদের পরপরই বামপন্থি কর্মীরা ত্বরিত আলোচনায় বসেন। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে চৌধুরী হারুনুর রশিদ, সুচরিত চৌধুরী, গোপাল বিশ্বাস, রুহুল আমিন নিজামী, ফকির আহমদ লালদিঘির ময়দানে চলে যান। সেখানে সেদিন দোকান কর্মচারী সমিতির সম্মেলন চলছিল। সে সম্মেলনে চৌধুরী হারুন ছিলেন আমন্ত্রিত বক্তা। তিনি তাঁর বক্তব্যে ঢাকার গুলির সংবাদ জানান ও জনতাকে এর প্রতিবাদে মিছিল করতে আহ্বান জানালে উপস্থিত জনতা সাথে সাথে মিছিলে নেমে পড়ে। পরে আরো ব্যাপক জনগণ যোগদানের ফলে এটা বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হয়। মিছিল শেষে এতে বক্তব্য দেন খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। এর পুরোভাগে ছিলেন ডা. নুরুল আজিম, ডা. সৈয়দ, মোহর আলী চৌধুরী, ডা. এম এ মান্নান, ডা. শামসুল আলম প্রমুখ। সভায় মাহবুব উল আলম চৌধুরী অসুস্থ অবস্থায় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' নামে একটি কবিতা লিখে পাঠালে সভায় তা পড়ে শোনান হয়।

মিছিল শেষে সন্ধ্যায় 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'র এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী অসুস্থ থাকায় সে সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী। বক্তব্য দেন এম এ আজিজ, ডা. আনোয়ার হোসেন, ছালামত আলী খান। এ সভায় ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি হরতাল ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি লালদিঘিতে জনসভার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি আংশিক হরতাল হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে সরকার নীরব ছিল। চট্টগ্রামে লিফলেট, পোস্টারিং হয় ব্যাপকভাবে। শহরের মাঝে ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয় রেলে। পাহাড়তলী রেলের লোকোশেডের কর্মচারীরা ধর্মঘট করার ফলে রেল অচল হয়ে পড়ে। ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি রেল বন্ধ থাকে। পরে এম এ আজিজ, আজিজুর রহমান শ্রমিকদের বুঝিয়ে রেল চালুর ব্যবস্থা নেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে লালদিঘিতে এক জনসভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম লীগ নেতা রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী। ভাষণ দেন অপর মুসলিম লীগ নেতা এ কে খান।

ঢাকাতে গুলি হওয়ার পর চট্টগ্রাম শহর, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, মিরসরাই, সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, কক্সবাজার, পটিয়া, আনোয়ারাসহ চট্টগ্রামের সব থানার স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বের করে। কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অথবা সংগ্রাম পরিষদের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ এসব মিছিলে ছিল না। এসব মিছিলের প্রধান কারণ ছিল ছাত্রহত্যা। ভাষার ব্যাপারটার চাইতে তখন মিছিলকারীদের কাছে এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

শহর ও জেলা পর্যায়ে এ আন্দোলনে আরো জড়িত ছিলেন– ইঞ্জিনিয়ার আজিজ, ড. মাহফুজ, চৌধুরী শাহাবুদ্দিন খালেদ, রেল শ্রমিক নেতা মুসলেহউদ্দিন, নুরুজ্জামান, কৃষ্ণ গোপাল সেন, শামসুদ্দিন আহমদ, মফিজুল ইসলাম, সুধাংশু ভট্টাচার্য, সর্দার শামসুদ্দিন, মণীন্দ্র মহাজন, সুনীল মহাজন, ডা. সরেস দে, গোপাল বিশ্বাস, আমির হোসেন দোভাষ, আবদুল কাদের, কবি আবদুস সালাম, দৌলতুর রহমান, আবদুল্লাহ আল হারুন, লুৎফুর রহমান, আহমেদুর রহমান আজমী, শহীদ সাবের, পল্লব দাশগুপ্ত, ননী ধর, এনামুল হক, ডা. অজিত চৌধুরী, এন জি মাহমুদ কামাল, এ কে এম আবদুল মান্নান, এম ছিদ্দিক, ইসহাক মিয়া, মনিরুজ্জামান, হাফেজ মো. শরীফ, ডা. আয়ুব আলীসহ অনেকে। গুলির প্রতিবাদে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে সভা করেন জহুর আহমদ চৌধুরী, তোহফতুন্নেছা আজিম, এস এম শামসুল ইসলাম প্রমুখ।

পাহাড়তলীতে ডা. মোহাম্মদ আলী, আবু নাসের, ইউছুফ জামাল, এনামুল হক, কাসেম আলী, রহিমা খাতুন, আবদুল বাকি, এয়ার মোহাম্মদ, আবু জাকের, মফিজুর রহমান, তফাজ্জল আলী, সাবু মিয়া, তোফাজ্জল আলী (২), মফিজুর রহমান নানা কর্মসূচির সাথে জড়িত ছিলেন। রাউজান থানাতেও গুলির প্রতিবাদে মিছিল হয়েছে ডা. নুরুল ইসলাম, রাজমোহন শর্মা, আবদুল হাই, মনির আহমদ, মাঈনুদ্দিন, মুছা প্রমুখের নেতৃত্বে।

চকরিয়াতে স্কুল-কলেজ ধর্মঘটসহ গুলির বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছে এস কে শামসুল হুদা, আবদুল মালেক মাস্টারের নেতৃত্বে। মিরসরাইতে এ টি এম শামসুদ্দিন, সীতাকুণ্ডে ডা. কাফি খান, ড. রশিদ আল ফারুকী, আনোয়ারায় আবু বকর সিদ্দিকী ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

হাটহাজারীতে এম এ ওহাব সক্রিয় ছিলেন। সাতকানিয়াতে মো. ইবরাহিমের নেতৃত্বে মিছিল হয়। ১৯৫২ সালে বোয়ালখালীর স্যার আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক নির্মল সেন, প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী, অংশুমান হোর, প্রফেসর কায়কোবাদ, প্রফেসর বদরুল হায়দার চৌধুরী ভাষা আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। তাঁদের সাথে ছাত্রদের মাঝ হতে ছিলেন ডা. শহীদুল্লাহ, আবুল বাশার, গোলাম রহমান, নুরুল ইসলাম প্রমুখ। তৎকালীন সময়ে স্যার আশুতোষ কলেজ দক্ষিণাঞ্চলে ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

ভাষা আন্দোলনের পর ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের নিয়ে 'ভাষা সংগ্রাম কমিটি' হয়। এ ভাষা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন ফজলুল্লাহ খান, আবদুস সালাম, মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী, আবদুল্লাহ আল হারুন, আজিজুল ইসলাম, ডা. এ টি এম মুছা, এম এ হালিম, এমদাদুল ইসলাম।

ভাষা আন্দোলনের পর ফেব্রুয়ারির শেষদিকে এসে এম এ আজিজ গ্রেপ্তার হন। ভাষা আন্দোলনের সময় লিফলেট ছাপাবার অপরাধে পুলিশ কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসে হানা দেয়। প্রেসের ম্যানেজার দবিরুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলা চলে, এখানে আন্দোলন হয়েছে গ্রামীণ পর্যায়ে পর্যন্ত। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রথম ছাত্র-যুবকরা ব্যাপকভাবে সরকারবিরোধী সভা-মিছিল করতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগবিরোধী বা সরকারবিরোধী এ ছোটো মিছিলগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

জামাল উদ্দিন: সাংবাদিক, গবেষক ও লেখক

ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম

মহিউদ্দিন আল আমান শাহেদ

একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রধান ভিত্তি হলো তার ভাষা। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই প্রাণের ভাষাকে মর্যাদার আসনে বসাতে বাঙালি জাতিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জাতি যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিল সেটাই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলন কেবল ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-ই ছিল না– বরং বাঙালির নিজস্ব জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের অনুঘটক ছিল, যা পরবর্তীতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে। এরই চূড়ান্ত ফলশ্রুতিতে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তান অংশের জনগণের ভাষা ছিল বাংলা। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষাগত অধিকারকে অস্বীকার করে। এর ফলে বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদে প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ আপামর জনগণ বক্তৃতা, মিছিল মিটিং করে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা মিছিল, সভা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা ছড়িয়ে দেয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাজপথ পর্যন্ত। কিন্তু, শাসকগোষ্ঠী জনগণের এই প্রাণের দাবিকে দমন করতে ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন নীলনকসা তৈরি করে। বাঙালিরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। এই অপ্রতিরোধ্য গণজাগরণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। মিছিলে মিছিলে ঢাকার রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুপুরের দিকে মিছিলকারীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। পুলিশ তখন অন্যায়ভাবে মিছিলকারীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। বর্বরোচিত গুলিবর্ষণে রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, শফিকসহ নাম না জানা আরও অনেকে শহিদ হন। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। এই আত্মত্যাগ কেবল একটি ভাষার জন্য নয়, এটি আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার জন্য চিরন্তন এক প্রতিবাদ– যা যুগে যুগে মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে যাবে। রক্তে রঞ্জিত বীর শহিদদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়েই একদিন মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। অতঃপর ১৯৫৬ সালের ২৯শে

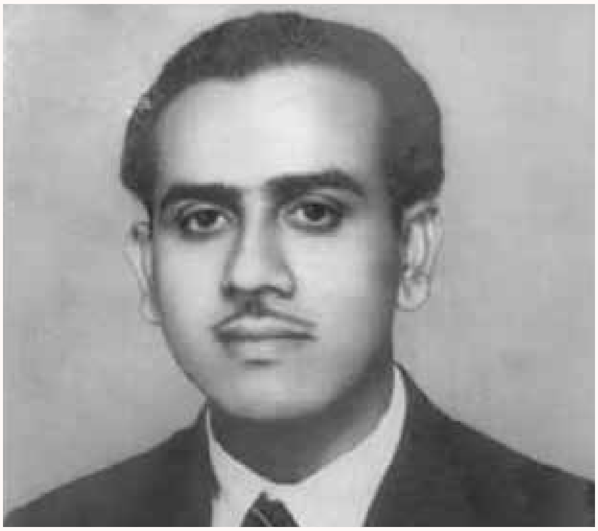

ভাষাসৈনিক শওকত আলী

ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। এটি ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বিজয়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা ও ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭শে নভেম্বর এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

পরিশেষে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, যেই ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালিরা এত ত্যাগ স্বীকার করেছে, বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে রাজপথে। সেই বাংলা ভাষা আজ অবহেলা, অবমূল্যায়ন আর উদাসীনতার শিকার। দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরেও বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার ও মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। ভাষা শহিদদের আত্মদান আমাদের গর্বের ইতিহাস হলেও, তাদের আদর্শ ধারণ ও বাংলা ভাষার যথাযথ চর্চায় আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি। এ অবহেলা শুধু একটি ভাষার নয়, বরং একটি জাতির আত্মপরিচয় ও চেতনার প্রতিও অবমাননা।

আমি ভাষাসৈনিক শওকত আলীর সন্তান। তাই আমি একজন ভাষাসৈনিকের সন্তান হিসেবে মনে করি এখন সময় এসেছে, সবাই মিলে যার যার অবস্থান থেকে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার। এই দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের নয় বরং এ দায়িত্ব আমাদের সবার। সচেতন ব্যবহার, শুদ্ধ চর্চা আর আন্তরিক ভালোবাসার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা তার যথাযথ স্থান ফিরে পাবে।

মহিউদ্দিন আল আমান শাহেদ: ভাষাসৈনিক শওকত আলীর সন্তান

ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং অমর একুশে বইমেলা

নুরুল ইসলাম বাবুল

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।
(একুশের গান/ আবদুল গাফফার চৌধুরী)

মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য রক্ত দেওয়ার ইতিহাস, জীবন দেওয়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি সেই বিরল ইতিহাস স্থাপন করেছে নিজেদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে। ফলে একটি বর্বর শাসকগোষ্ঠীর রোষানল থেকে মুখের ভাষা বাংলা ভাষাকে মুক্ত করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়েছে বীর বাঙালি। ভাষা আন্দোলনের সেই চেতনা বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকেও সচল করেছে। সেই পথে দীর্ঘ সময়ের যাত্রা শেষে অর্জিত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা ও চূড়ান্ত বিজয়। পৃথিবীর মানচিত্রে রচিত হয়েছে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর এর মাধ্যমেই একটি স্বাধীন দেশের নানা অনুষঙ্গের সাথে শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও যুক্ত হয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। অমর একুশে বইমেলা আমাদের সেই চেতনার ধারক ও বাহক হিসেবে প্রাণের বইমেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্রিটিশদের দুইশত বছরের শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা। সেই সাথে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সংগত কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ঘটনা স্বাভাবিক। কিন্তু কখনোই তা বাস্তবসম্মত ছিল না। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই দুটি অংশের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে দুটো অংশের শাসনভার ন্যাস্ত ছিল এবং শাসনব্যবস্থায় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বলেই তারা অল্প সময়ের মধ্যেই নানামুখী বৈষম্যের সৃষ্টি করে ফেলে। ফলে দেশভাগের পর যে স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে জাতি হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় দেখা দিয়েছিল তা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে তছনছ হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনসাধারণের। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা প্রথম বড়ো যে আঘাত আসে তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষার উপর। তারা এই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ক্রমাগতভাবে ঘোষণা করা হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু । প্রচার করা হয়– 'এক দেশ, এক নেতা, এক ভাষা।' লেখক ও গবেষক আহমদ রফিক 'পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক : উর্দু বনাম বাংলা' শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের শেষদিক থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলা বনাম

উর্দুর বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। প্রধানত ছাত্রসমাজ এবং অংশত সরকারি কর্মচারীদের দিক থেকে বাংলার পক্ষে সভা, সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে দাবি জানানো হয়। প্রতিবাদ ওঠে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে। বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।' (ভাষা আন্দোলন, সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে, পৃষ্ঠাঃ ৩৯)। একই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, '... ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদে ব্যবহারের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখা হয়। প্রস্তাব রাখেন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।... কিন্তু গণপরিষদের অবাঙালি ও মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যদের বিরোধীতায় এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এতেও বুঝতে পারা যায় যে, পাকিস্তানের শাসকরা কোনোক্রমেই বাংলা ভাষাকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না।' (পৃষ্ঠা : ৪০) । কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন মানুষ এই অন্যায় মেনে নেয়নি। মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা জানি, পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু বিষয় থাকে, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা এক অমূল্য সম্পদ। মধ্যযুগীয় কবি সৈয়দ সুলতান এ সম্পর্কে তাঁর কবিতায় লিখেছেন–

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে স্থাপিত ভাস্কর্য মোদের গরব

> যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
> সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।

যেহেতু বাঙালি চিরকালই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোচ্চার। তাই নিজ ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে অর্থাৎ তাদের অমূল্য সম্পদ রক্ষায় তারা কখনোই পিছপা হয়নি। ফলে বাংলা ভাষার উপর যখন আঘাত এলো ঠিক তখনই চিরকালের রক্তে মিশে থাকা প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠল দাবানলের মতো। তাই গণপরিষদে অন্যায়ভাবে প্রস্তাবটি বাতিল হওয়ায় ১১ই মার্চ প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আর এভাবেই সংগঠিত রূপে প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। তারপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মতো 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'। অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলনের বিস্ফোরণ। ভাষা আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ছিল– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। বিস্ফোরক আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ নেয়, তখন তা রুখে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার ছাত্র-যুবক-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখলে মিছিলের উপর গুলি চালায় তৎকালীন সরকারের পুলিশ বাহিনী। ফলে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবুল বরকত শহিদ হন। পরে সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার, অহিদুল্লাহসহ নাম না-জানা অনেকেই শাহাদতবরণ করেন। এই রক্ত বৃথা যায়নি। শহিদের বুকের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষার অধিকার। শহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদমিনার হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় চেতনার তীর্থস্থান। ফেব্রুয়ারি মাস হয়ে উঠেছে আমাদের ভাষার মাস।

বাহান্ন পরবর্তী সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ করতে গিয়ে বাঙালি জাতি একত্রিত হয়েছে। তারা শহিদমিনারে এসে দাঁড়িয়েছে একই পতাকাতলে। এভাবে প্রতিবছর একই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সংগঠিত হয়েছে বাঙালি। বছরের পর বছর ধরে এই জমায়েত বাঙালিকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করেছে, তেমনি জুগিয়েছে অদম্য সাহস। সেই সাথে বর্বর পাকিস্তানি শাসকদলের বৈষম্য, নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙালি চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তৈরি হতে থাকে। এক্ষেত্রে মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনা শক্তি হয়ে প্রবেশ করে বাঙালির বুকে। এভাবেই আসে স্বাধীনতা সংগ্রামের অদম্য সাহস ও প্রেরণা। ১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা তথা মহান বিজয়। ভাষা আন্দোলনের সেই চেতনায় আজও বাঙালি জাতির রক্তে মিশে আছে বলেই নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি পেয়েছে অনন্য সম্মান।

ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পাশাপাশি এই ভাষার সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ পালাবদল ঘটেছে। একুশের চেতনায় রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, গান, কবিতা, উপন্যাস। সমৃদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে বাংলা ভাষা তথা বাংলাদেশের সাহিত্য। একুশের চেতনাকে ধারণ করেই প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী

বাংলা একাডেমি আয়োজন করে থাকে 'অমর একুশে বইমেলা'। বইমেলার ইতিহাস জানতে উইকিপিডিয়ার পাতায় চোখ বুলিয়ে জানা গেল, এই মেলার ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশের মতোই প্রাচীন। যতদূর জানা যায়, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অন্যান্যরা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৩ সালে কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন সম্পন্ন করেন'। এই বইমেলা এখন পুরো মাসব্যাপী বাঙালির অন্যতম উৎসবে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ দীর্ঘ সময়ের বইমেলা হিসেবে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। বইমেলার পরিসর প্রতিবছর বৃদ্ধি হতে হতে এখন তা বিশালাকার ধারণ করেছে। আর তাই এক সময়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলেও এখন তা ব্যাপ্তি লাভ করেছে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল অঙ্গনজুড়ে। লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের এই মিলনমেলা নানারূপে ও রঙে বর্ণিল হয়ে প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। সেই সাথে প্রতিবছর দেশের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকদের পাশাপাশি তরুণ লেখকদের বই প্রকাশিত হচ্ছে একুশের বইমেলা উপলক্ষ্যে। একুশের বইমেলাকে অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরগুলোতেও বইমেলা আয়োজন হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি এর চেতনাকে ধারণ ও লালন করার মাধ্যমে শিশুদের তথা আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে মহান একুশের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী প্রাণের বইমেলাকে আরও সুন্দর ও নান্দনিক করে আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপান্তরিত করা যেতেই পারে। তাতে বাংলা সাহিত্যের সাথে বিশ্বসাহিত্যের যোগাযোগ আরও নিবিড় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

নুরুল ইসলাম বাবুল: সহকারী শিক্ষক, শিশুসাহিত্যিক, কবি ও কলামিস্ট

যুব উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫-এর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ত্রিপক্ষীয় কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এর সাথে যুব উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫ আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ১৫ই জানুয়ারি এ বিষয়ে গণমাধ্যম থেকে জানা যায়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলমের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এবং যুব অনুবিভাগের প্রধান ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস এবং ইউএনডিপি'র পক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ সরদার এম আসাদুজ্জামান।

এ উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারের যুব উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫-কে কার্যকর, সময়ভিত্তিক এবং বাস্তবমুখী পদক্ষেপে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা দেশব্যাপী যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ জোরদার করবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেন, এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা যুব উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫ বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যুবদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে এটি সহায়ক হবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি নীতিগত অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

এর মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদার হবে এবং সরকার, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্যোগসমূহকে একীভূত করা সম্ভব হবে। কর্মপরিকল্পনায় গ্রামীণ এলাকা ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবসমাজের অন্তর্ভুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: সুমন শেখ

দেশে দেশে বসন্ত

প্রণোতোষ কুমার

ফুল ফুটুক না ফুটুক,
আজ বসন্ত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা একটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, যা মূলত প্রকৃতির রঙের চেয়েও মানুষের মনের জাগরণ ও আশাবাদী অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলে। এটি বসন্তের আগমনকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানায়, যেখানে ফুল ফোটা না ফোটা মুখ্য নয়, বরং বসন্তের আগমনই প্রধান।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তকে এক সাথে বলা হয় ষড়ঋতু। আর ঋতুচক্রের আবর্তনে বসন্ত এক অনন্য অধ্যায়। শীতের জড়তা ভেঙে প্রকৃতিতে যখন নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে, তখনই আসে ঋতুরাজ বসন্ত। গাছে গাছে নতুন পাতা, রঙিন ফুলের সমারোহ, পাখির কোলাহল– সব মিলিয়ে বসন্ত মানেই নবজাগরণ। কেবল প্রকৃতির মধ্যেই নয়, মানবজীবনের সংস্কৃতি, উৎসব ও শিল্পচর্চাতেও বসন্তের প্রভাব গভীর। কোথাও রঙের খেলায়, কোথাও ফুলের সৌন্দর্যে, আবার কোথাও ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানে বসন্ত উদ্‌যাপিত হয়।

বাংলাদেশে বসন্ত আসে ফাল্গুন মাসে। ঋতুরাজকে বরণ করে নেওয়ার প্রধান দিন হলো পহেলা ফাল্গুন। এদিন মানুষ হলুদ, বাসন্তী, কমলা রঙের পোশাকে সেজে ওঠে। গ্রাম থেকে শহর– সর্বত্র বসন্ত উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদকেন্দ্রিক বসন্ত উৎসব এখন জাতীয় সংস্কৃতির অংশ। বসন্তের সঙ্গে ভালোবাসা দিবস যুক্ত হওয়ায় তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ আরও বেড়েছে। গান, কবিতা, নৃত্য ও লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকৃতির নবজাগরণকে উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া বিশেষ করে ছায়ানটের আয়োজিত অনুষ্ঠান বসন্ত উদ্‌যাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বসন্ত এখানে কেবল ঋতু পরিবর্তন নয়, বরং বাঙালির সংস্কৃতি ও চেতনাবোধের প্রতীক।

বাংলাদেশিরাই যে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠে বিষয়টি মোটেও তা নয়; ঋতু ভেদে সারাবিশ্বেই পালিত হয় বসন্ত। পৃথিবীর নানা দেশে নানা নামে, নানা রীতিতে বসন্তকে বরণ করে নেওয়া হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসন্ত উদ্‌যাপনের রূপ ও তাৎপর্য তুলে ধরা হলো–

ভারত: পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বসন্ত উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব

এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহে পালিত হয়। কবিগুরুর 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল'– এই গান গেয়ে, নৃত্য ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও অতিথিরা শান্তিনিকেতনে বসন্তকে বরণ করে নেন। হলুদ ও বাসন্তী রঙের পোশাক, আবিরের রঙে রাঙানো প্রাঙ্গণ এবং রবীন্দ্রসংগীতের সুরে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই বসন্তোৎসবই পরিচিত 'হোলি' নামে। এদিন মানুষ একে অপরের গালে আবির মেখে শুভেচ্ছা জানায়।

উত্তর ভারতের বৃন্দাবন ও মথুরা অঞ্চলে হোলির ঐতিহ্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। এখানে ধর্মীয় আচার, লোকসংস্কৃতি ও সামষ্টিক আনন্দ এক অনন্য মেলবন্ধনে রূপ নেয়। সংগীত, নৃত্য, শোভাযাত্রা ও রঙের খেলায় বসন্ত উৎসব পরিণত হয় এক সর্বজনীন আনন্দোৎসবে।

জাপান: জাপানিদের সবচেয়ে প্রিয় ফুল হলো 'চেরি', যা তারা 'সাকুরা' নামে ডাকে। বসন্তে ফুটে ওঠা এই সাকুরা ফুলকে ঘিরেই জাপানে বসন্ত উদ্‌যাপনের সূচনা। সপ্তম শতাব্দী থেকেই জাপানিরা সাকুরা ফোটার আনন্দে উৎসবে মেতে উঠতে শুরু

করে। জানুয়ারি মাস থেকেই দেশের কিছু অঞ্চলে ফুল ফোটা শুরু হলেও মার্চ থেকে মূল উৎসবের আয়োজন জমে ওঠে। পুরো দেশ তখন গোলাপি-সাদা সাকুরায় ছেয়ে যায়, আর প্রকৃতি ধারণ করে এক অপরূপ রূপ। এই ফুল দেখা ও উপভোগ করার উৎসবের নাম 'হানামি'।

জাপানিরা বসন্তকালে পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীরা পার্কে জড়ো হয়ে সাকুরা গাছের নীচে পিকনিক করেন, গান গেয়ে ও আড্ডায় মেতে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন। টোকিও ও কিয়োটোসহ বিভিন্ন শহরে এ সময় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাতের বেলায় আলোকসজ্জার মাধ্যমে 'ইয়োজাকুরা' বা রাত্রিকালীন ফুল দেখার বিশেষ আয়োজনও থাকে। জাপানিদের কাছে হানামি শুধু একটি ফুল উৎসব নয়; এটি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও নতুন সূচনার গভীর সাংস্কৃতিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্রে বসন্ত উদ্‌যাপন মূলত প্রকৃতি, অবকাশ ও সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শীতের শেষে আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে এলে পার্ক, বাগান ও সমুদ্রসৈকত মানুষে ভরে ওঠে। বিশেষ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে পালিত National Cherry Blossom Festival বসন্তের অন্যতম আকর্ষণ; যেখানে জাপানের উপহার দেওয়া চেরি গাছের ফুল ফোটাকে ঘিরে শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি মার্চ-এপ্রিল মাসে শিক্ষার্থীদের 'স্প্রিং ব্রেক' ছুটি থাকে; এ সময় অনেকেই ভ্রমণ, সমুদ্রসৈকতে অবকাশযাপন বা পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটায়। বিভিন্ন শহরে ফুল উৎসব, কৃষক বাজার ও আউটডোর কনসার্টের আয়োজনও বসন্তকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে 'ইস্টার' নামক খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব, যা যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান স্মরণে পালিত হয়। এটি সাধারণত মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়– অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে বসন্তকালে। ইস্টারের তারিখ নির্ধারিত হয় বসন্ত বিষুবের 'স্প্রিং ইকুইনক্স' (Spring Equinox) পর প্রথম পূর্ণিমার পরবর্তী রবিবারে। তাই এটি সবসময় বসন্ত ঋতুর সঙ্গেই যুক্ত। বসন্ত যেমন নতুন জীবন ও পুনর্জাগরণের প্রতীক, তেমনি ইস্টারও পুনরুত্থান, নতুন আশা ও আধ্যাত্মিক নবজন্মের প্রতীক। ইস্টারের সঙ্গে অনেক বসন্তকালীন প্রতীক জড়িত; যেমন– ডিম (নতুন জীবনের প্রতীক), খরগোশ (উর্বরতার প্রতীক) ও ফুল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বহু দেশে ইস্টার উপলক্ষ্যে চার্চে প্রার্থনা, ডিম সাজানো (Easter egg decorating), 'ইস্টার এগ হান্ট' এবং পারিবারিক ভোজের আয়োজন করা হয়।

চীন: এশিয়ার প্রভাবশালী দেশ চীনে বসন্ত উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। চৈনিক পঞ্জিকা অনুযায়ী চান্দ্র নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় এই উৎসব, যা সাধারণত জানুয়ারির শেষ ভাগ থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পড়ে। এই বসন্ত উৎসবকে বলা হয় 'চুনজে', যা স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল বা চীনা নববর্ষ নামেও পরিচিত। উৎসব উপলক্ষ্যে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, নতুন পোশাক পরা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলিত হওয়া, লাল রঙের লণ্ঠন ও ব্যানার দিয়ে বাড়ি সাজানো–

এসবই এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ড্রাগন নৃত্য, সিংহ নৃত্য ও আতশবাজি উৎসবকে আরও বর্ণিল করে তোলে।

চীনা লোককথায় বলা হয়, 'নিয়ান' (নিয়োন) নামের এক অপদেবতা শীতনিদ্রা শেষে গ্রামে এসে গবাদিপশু, শস্য এমনকি শিশুদেরও ক্ষতি করত। তার ভয়ে গ্রামবাসীরা দরজার সামনে খাবার রেখে দিত, যেন সে তা খেয়ে চলে যায়। একসময় তারা লক্ষ করল, লাল রং ও উচ্চ শব্দে নিয়ান ভয় পায়। এরপর থেকেই লাল রঙের সাজসজ্জা ও আতশবাজির প্রচলন শুরু হয়। বিশ্বাস করা হয়, এতে অশুভ শক্তি দূরে থাকে। উৎসবের সময় চীনারা নানারকম ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। শুধু চীনেই নয়, বহু মঙ্গোলীয় ও পূর্ব এশীয় নৃগোষ্ঠীর মধ্যেও এই নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়।

উৎসবের শেষ দিনে পালিত হয় ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যাল, যেখানে রঙিন ফানুস প্রজ্বলন ও আকাশে উড়ানোর মাধ্যমে বসন্ত উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এভাবেই চীনে বসন্ত মানে নতুন বছরের সূচনা, অশুভের বিদায় এবং আশাবাদের উজ্জ্বল প্রকাশ।

থাইল্যান্ড: থাইল্যান্ডে বসন্তকালে পালিত প্রধান উৎসব হলো 'সঙক্রান', যা থাই নববর্ষ হিসেবেও পরিচিত। প্রতিবছর সাধারণত ১৩ থেকে ১৫ই এপ্রিল এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং এটি শুদ্ধতা, নতুন সূচনা ও আশীর্বাদের প্রতীক। এ উৎসবের সময় শহরের রাস্তায় মানুষ একে অপরের ওপর পানি

ছিটিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। জল ছিটানোর এই উৎসব আমাদের দেশের মারমা সম্প্রদায়েও করা হয়ে থাকে। জল এখানে শুধু মজা নয়; এটি পুরানো বছরের হিংসা, বিদ্বেষ, দুঃখ ও গ্লানি ধুয়ে ফেলার প্রতীক। মানুষ নিজেকে জলে ভিজে পবিত্র করে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। উৎসবের সঙ্গে যুক্ত আচারগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা করা, বুদ্ধমূর্তিতে সুগন্ধি জল ঢেলে শ্রদ্ধা দেখানো এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে পানি ঢেলে আশীর্বাদ গ্রহণ করা অন্যতম।

বিশেষ করে চিয়াং মাই ও ব্যাংককে সঙক্রান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। রাস্তায় জলকেলি, সংগীত, নৃত্য ও আনন্দ-উল্লাসে পুরো শহর উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। এটি শুধু পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক নয়, বরং বসন্তের নবজাগরণকে উদ্‌যাপনের এক আনন্দময় এবং প্রাণবন্ত প্রকাশ।

স্পেন: স্পেনে বসন্ত উদ্‌যাপন জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা, নৃত্য ও সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত সমাহার। বিশেষ করে ভ্যালেন্সিয়ার 'লাস ফায়াস' (Las Fallas) উৎসব বসন্তের সবচেয়ে বিখ্যাত

উদাহরণ। এটি প্রতিবছর মার্চের মাঝামাঝি থেকে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং শহরকে রঙিন, প্রাণবন্ত ও আলোছায়ায় ভরিয়ে দেয়। লাস ফায়াসে বিশাল কাঠ ও কাগজের ভাস্কর্য বা 'নিনোটস' তৈরি করা হয়, যা সমাজ, রাজনীতি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ফুটিয়ে তোলে। উৎসবের শেষ দিনে এই ভাস্কর্যগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, যা পুরানোকে বিদায় এবং নতুন সূচনার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়াও উৎসবে আতশবাজি, প্যারেড, সংগীত ও নৃত্য উদ্‌যাপনের প্রাণকে আরও উজ্জ্বল করে।

স্পেনের অন্যান্য শহরে বসন্তকালীন উৎসবে রঙিন শোভাযাত্রা, ফুলের মেলা ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে আয়ারল্যান্ড, রোমানিয়া, ইতালি ও ক্রোয়েশিয়ার মতো ইউরোপীয় দেশগুলোতেও বসন্ত উৎসব পালিত হয়, কিন্তু স্পেনের লাস ফায়াস তার জাঁকজমক, আগুনের ভাস্কর্য ও সামাজিক আনন্দের কারণে অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।

মেক্সিকো: মেক্সিকোতে বসন্ত ঋতুকে বলা হয় 'সান মার্কোস'। প্রতিবছর ২০-২১শে মার্চ দলে দলে মানুষ 'স্প্রিং ইকুইনক্স' উদ্‌যাপন করতে সাদা পোশাক পরে শহর থেকে ৩০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশাল তুতিহুয়াসান পিরামিডে সূর্যোদয় দেখতে যায়। অনেকেই ৩৬০ সিঁড়ি চড়ে পিরামিডের মাথায় পৌঁছে যায়, সূর্যের কাছাকাছি গিয়ে সারা বছরের জন্য প্রাণশক্তি শুষে নেওয়ার সংস্কারে দুহাত তুলে রোদ পোহায়। এরপর শুরু হয়ে যায় মেলা। তিন সপ্তাহব্যাপী এই বসন্ত উৎসব মেক্সিকোর বৃহত্তম উৎসব। অগণিত পর্যটক আসেন মোরগ লড়াই, সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা ও নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান দেখতে।

পারস্য ও মধ্য এশিয়া: পারস্য (ইরান) এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে বসন্তের আগমনকে কেন্দ্র করে পালিত প্রধান উৎসব হলো 'নওরোজ' (Nowruz), যা পারস্য নববর্ষ হিসেবেও পরিচিত। এটি মার্চের ২০-২১ তারিখে বসন্ত বিষুবের সঙ্গে মিলিয়ে উদ্‌যাপিত হয় এবং হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে। নওরোজ নতুন সূচনা, জীবনের পুনর্জাগরণ এবং শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক।

নওরোজের আগমনকে ঘিরে মানুষ ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে, নতুন পোশাক পরেন এবং পরিবারের সঙ্গে মিলনমেলা করেন। 'হাফ্ত-সীন' নামের একটি টেবিল সাজানো হয়, যার উপরে সাতটি জিনিস রাখা হয়– যা জীবনের বিভিন্ন শুভ গুণাবলির প্রতীক। এই সময়ে পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়, গান, নৃত্য ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন হয়।

মধ্য এশিয়ার তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও আফগানিস্তানের মতো দেশেও নওরোজ পালিত হয়। এই অঞ্চলে বসন্ত উৎসবে নাচ, গীত, ঘোড়দৌড় ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনও থাকে। এছাড়া আগুনের উপর লাফ দেওয়া, বিশেষ খাবার প্রস্তুত করা এবং জলভর্তি আচারের মতো রীতি-নীতি এই উৎসবের অংশ।

নেদারল্যান্ডস: নেদারল্যান্ডসে বসন্তের আগমন মূলত ফুলের উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ করে টিউলিপের বিশাল ক্ষেত এবং কিউকেনহফ উদ্যানের রঙিন ফুলসমারোহ দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বসন্তকাজের অংশ। প্রতিবছরের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত এই উৎসব চলে, যখন টিউলিপ, ড্যাফোডিল, নার্সিসাসসহ নানা রঙের ফুল ফোটে এবং পুরো দেশ যেন এক বিশাল রঙিন কার্পেটে পরিণত হয়।

কিউকেনহফে দর্শনার্থীরা পার্কে ঘুরে বিভিন্ন রঙের ফুলের বাগান উপভোগ করেন। এছাড়া বাগান প্রদর্শনী, নৃত্য, সংগীতানুষ্ঠান, ফুলের শোভাযাত্রা এবং শিল্পকর্মের প্রদর্শনও বসন্তকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। শহরগুলোতেও রাস্তায় রঙিন ফুল, প্রদর্শনী এবং উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

ঋতুরাজ বসন্ত কেবল একটি ঋতু নয়, এটি মানবসভ্যতার সর্বজনীন আনন্দ ও নবজাগরণের প্রতীক। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে এশিয়া, আমেরিকা ও ওশেনিয়া– প্রতিটি দেশ নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী বসন্তকে উদ্‌যাপন করে। রীতির ভিন্নতা থাকলেও মূল সুর এক– পুরানোকে পেছনে ফেলে নতুন জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া। তাই বলা যায়, বসন্ত মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক রঙিন অধ্যায়।

প্রণোতোষ কুমার: ফ্রিল্যান্স লেখক

দেশের প্রথম সরকারি ফ্রিল্যান্সার আইডি ম্যানেজমেন্ট সফ্‌টওয়্যার উদ্বোধন

দেশের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য একটি স্বচ্ছ, নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে দেশের প্রথম সরকারি ফ্রিল্যান্সার আইডি ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৩ই জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি বিভাগের সভাকক্ষে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এই সফ্টওয়্যার উদ্বোধন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে হয়রানি ও আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ফ্রি রাখা হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে– আবেদন ফি, নবায়ন ফি ও প্রসেসিং ফিসহ সব ধরনের আর্থিক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট হয়রানি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নতুন এই ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ডের মাধ্যমে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সাররা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ, ঋণ ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধা, আর্থিক প্রণোদনা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহজে গ্রহণ করতে পারবেন। একই সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় ফ্রিল্যান্সার ডেটাবেজ হিসেবে কাজ করবে, যেখানে ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা, দক্ষতা ও কাজের ধরন সংরক্ষিত থাকবে, যা ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, এই উদ্যোগের ফলে ফ্রিল্যান্সারদের পরিচয় যাচাই সহজ হবে, ব্যাংকিং ও ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা কমবে এবং দেশের ফ্রিল্যান্সিং খাত আরো স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

ষাটগম্বুজ মসজিদ

বাগেরহাট-ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মাজার এবং সুন্দরবন

জিয়াউল হক হাওলাদার

বাগেরহাট জেলা পর্যটন উন্নয়নের আরেকটি সম্ভাবনাময় সুবর্ণভূমি। কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের পর বাগেরহাটকে বাংলাদেশের তৃতীয় পর্যটন নগরী হিসেবে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না। বাগেরহাট জেলায় রয়েছে ইউনেস্কো ঘোষিত দুটি বিশ্ব ঐতিহ্য-অনিন্দ্য সুন্দর 'ষাট গম্বুজ মসজিদ কমপ্লেক্স সিটি' এবং বিশ্বের বিস্ময় 'সুন্দরবন'। আরো রয়েছে 'হজরত খান জাহান আলীর মাজার' এবং 'খাঞ্জেলী দীঘি' বা 'ঠাকুর দীঘি', ঘোড়াদীঘি, পঁচাদীঘি। কিছুদূরে যাত্রাপুর গ্রামে রয়েছে সতেরো শতকের নান্দনিক অযোধ্যা মঠ। অযোধ্যা মঠকে স্থানীয় ভাষায় কোদলা মঠ বলা হয়ে থাকে। ষাটগম্বুজ মসজিদের অল্পদূরে রয়েছে খান জাহান আলীর বসতবাড়ি এবং জাহাজঘাটা। আরো রয়েছে খান জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত দীর্ঘ প্রাচীন রাস্তা। এই প্রাচীন রাস্তাটির উপর দিয়ে হাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে সেই প্রাচীন আমলের ইট এবং এটি কতটা মজবুতভাবে নির্মিত তা অবাক করার মতো। কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন এটি দুর্গ নগরীর প্রাচীর। জাহাজঘাটায় এখনো একটি প্রাচীন পাথর রয়েছে। সেই সময়ে এখান দিয়ে খরস্রোতা ভৈরব নদী বয়ে যেত। ভৈরব নদী দিয়ে আসা জাহাজগুলো এখানেই ভিড়ত। আমরা জানি ধামরাইতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো রথযাত্রা হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো রথমেলা হয় বাগেরহাটে। এখানকার বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তি জুলফিকার আলী ডাবলু বলেন, প্রাকৃতিক এবং পুরাকীর্তি রয়েছে বাগরেহাট জেলার আনাচে-কানাচে। এগুলোকে ঘিরে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ কমপ্লেক্স সিটিতে ষাটগম্বুজ মসজিদ ছাড়াও রয়েছে আরো ৭টি চোখ ধাঁধানো ছোটো ছোটো মসজিদ। এগুলোর নাম হচ্ছে– 'রণবিজয়পুর মসজিদ', 'বিবিবেগুনী মসজিদ', 'চুনখোলা মসজিদ', 'নয়গম্বুজ মসজিদ', 'সিংগাইর মসজিদ', 'দরগা মসজিদ', 'দশগম্বুজ মসজিদ'। এগুলো প্রতিটিই দেখতে ষাটগম্বুজের মতোই। ষাটগম্বুজ মসজিদের সম্মুখে রয়েছে একটি বিশাল দীঘি যা ঘোড়াদীঘি নামে পরিচিত। এই দীঘির পানি কখনোই কমে না।

ধারণা করা হয় হজরত খান জাহান আলী পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে খলিফাত-ই-আবাদ স্থাপন করেন এবং মসজিদ কমপ্লেক্স সিটি স্থাপন করেন। কথিত আছে এই মহাপুরুষ মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যশোরের বারো বাজার থেকে শুরু করে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করেছিলেন। লোনা পানির দেশ দক্ষিণাঞ্চলে পানীয় জলের এই দীঘিগুলো আপামর জনগণের কাছে খোদার আশীর্বাদের মতোই প্রতিভাত হয়েছিল এমন ধারণা করা যায়। আরো কথিত আছে, এদেশে আগমনের সময় তার সাথে যে ৩৬০ জন আউলিয়া

এসেছিলেন সম্ভবত তাঁদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করেছিলেন।

ষাটগম্বুজ মসজিদের মোট ৮১টি গম্বুজ রয়েছে। চতুষ্কোণের বুরুজের উপর ৪টি গম্বুজসহ ৭৪টি উল্টো চাড়ির ন্যায় ফাঁপা গম্বুজ এবং মধ্যের সারির বাংলা চালের অনুরূপ ৭টি চৌচালা গম্বুজসহ মোট ৮১টি গম্বুজ। এর নামকরণ নিয়ে এখনো অনেক মতভেদ রয়েছে। কেউ বলে এটি ছাদবিহীন গম্বুজ হওয়াতে ধীরে ধীরে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে ষাটগম্বুজ নামকরণ হয়েছে। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মনে করেন 'খাম্বাজ থেকে ষাটগম্বুজ' নামকরণ হয়েছে। খাম্বাজ ফারসি শব্দ; এর অর্থ হলো খাম্বা। ষাটগম্বুজ মসজিদের ভেতর ৬০টি খাম্বা রয়েছে যেগুলো পাথরের নির্মিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এর চৌচালা ছাদ ও গম্বুজগুলো ইট ও পাথরের ষাটটি খাম্বাজ পিলার দ্বারা নির্মিত। জনশ্রুতি আছে যে, হজরত পীর খান জাহান আলী মসজিদ নির্মাণের জন্য সমুদ্র পথে সুদূর চট্টগ্রাম, মতান্তরে ভারতের উড়িষ্যার রাজমহল থেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে জলপথে পাথরগুলো ভাসিয়ে এনেছিলেন। ইমারতটির গঠন বৈচিত্র্যে তুঘলক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০৮ ফুট এবং উচ্চতা ২২ ফুট। মসজিদের সম্মুখ দিকের মধ্যস্থলে একটি বড়ো খিলান এবং তার দুই পাশে একটি দরজাসহ মোট ২৬টি দরজা রয়েছে। ষাটগম্বুজ মসজিদটির নির্মাণ কাজ ১৪৪২ থেকে শুরু হয়ে ১৪৫৯ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো এই মসজিদ কমপ্লেক্স সিটিকে ৯৮৫তম বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ষাটগম্বুজ মসজিদের অদূরেই রয়েছে 'হজরত খান জাহান আলীর মাজার'। মাজারের সাথে রয়েছে খাঞ্জেলী দীঘি। দীঘিতে 'কালা পাহাড়' এবং 'ধলা পাহাড়' নামে দুটি বিশাল সাইজের কুমির ছিল যেগুলো পরে মারা যায়। পরবর্তীতে কিছু মিঠা পানির কুমির দীঘিতে ছাড়া হয়েছে। মাজার জিয়ারতের উদ্দেশে আগত পুণ্যার্থীরা দীঘির এই কুমিরগুলোকে হাঁস, মুরগি, ভেড়া, খাসিসহ নানা ধরনের মানতের পশু উৎসর্গ করে। মাজার কমপ্লেক্সে রয়েছে ৫টি চড়ুই পাখির মাজার। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এ চড়ুইগুলো হজরত খান জাহান আলীর পালিত দূত ছিল। মাজারের উপরের ছাদের নির্মাণশৈলী অত্যন্ত সুন্দর বর্গাকৃতির তুঘলকি স্থাপত্যের আদলে নির্মিত। দেখতে ষাটগম্বুজ মসজিদের মতোই। এর আয়তন ৪২ বর্গফুট এবং প্রাচীরের উচ্চতা ২৫ ফুট। ঢুকতে রয়েছে খিলান দরজা এবং উপরে ছাদবিহীন এক গম্বুজ। চারকোণায় রয়েছে পিলার, যা গম্বুজের মেঝে পর্যন্ত মিশেছে। এখানে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে বার্ষিক ওরস মোবারক এবং চৈত্র মাসের প্রথম পূর্ণিমায় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা (খাঞ্জালীর মেলা) অনুষ্ঠিত হয়। এই ওরশ এবং মেলা উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটন-ভক্ত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এখানে আসে।

খান জাহান আলীর মাজার

সুন্দরবন

বাগেরহাট জেলা খাবার-দাবারেও অনেক প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের চিংড়ি (বাগদা, গলদা) চাষের একটি বিশাল অংশ এ জেলায় উৎপাদিত হয়। আরো রয়েছে নানান প্রাকৃতিক মাছ যেগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু যেমন- পাইস্যা মাছ, লইট্যা মাছ, হরিণা চিংড়ি এবং ভেটকি মাছ। বাগেরহাটের আরেকটি সুস্বাদু খাবার হচ্ছে ঘি-কমল শাক, যা আর কোনো জেলায় পাওয়া যায় না। বাগেরহাটে বিশেষ ধরনের খেজুরের গুড় উৎপাদিত হয় যা খুবই মজাদার। বাগেরহাটের দধি, মিষ্টির তো কোনো তুলনাই হয় না। এখানকার রসগোল্লা মুখে দিলে নিমিষেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য বার বার খেতে ইচ্ছে করে।

ষাটগম্বুজ মসজিদ দেখতে এবং হজরত খান জাহান আলীর মাজার জিয়ারত করতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে ভিজিট করে। বাগেরহাট জেলায় এত বেশি দেশি-বিদেশি পর্যটক আসে যে এখানকার মানুষ সকল পর্যটকদের সবসময় সেবা দিয়ে থাকে। বাগেরহাট জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর চাইতে অর্থনৈতিকভাবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ জেলায় রয়েছে বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর মংলা। মংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠছে নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পর্যটনসহ নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সরকার মংলা বন্দরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত বন্দরের প্রতিদিন দেশি-বিদেশি আগত জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এই বিখ্যাত বন্দরকে কেন্দ্র করে অনেক দেশি-বিদেশি পর্যটক তথা মার্চেন্ট, কর্পোরেট কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, দেশি-বিদেশি জাহাজের নাবিক এবং ক্রুদের আগমন ঘটছে।

মোংলায় ইতোমধ্যে স্থাপিত ইপিজেডে বর্তমানে অনেক দেশি-বিদেশি বায়ারের এখানে আগমন ঘটে। অন্যদিকে এই ইপিজেডের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে আরো দেশি-বিদেশি বায়ার এবং পর্যটক এখানে আসবে। মোংলা বন্দরের অন্য পাড়ে জয়মনি নামক স্থানে সরকার বিশাল আকারের সাইলো বা খাদ্য গুদাম তৈরি করছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য সুন্দরবন ভ্রমণের সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মোংলা। মোংলাকে বলা হয় সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। বাংলাদেশের ট্যুর অপারেটরগণ যারা সুন্দরবনে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণদের সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য প্যাকেজ করে থাকে, তাদের প্রায় ৮০% মোংলা রুট ব্যবহার করেন।

স্থানীয় জনগণের মতে বাগরেহাট জেলা তথা সমগ্র খুলনা বিভাগের মধ্যে 'মোংলা বন্দর' এবং বিশ্বের বিস্ময় 'সুন্দরবন' দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ– যা পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ভবিষ্যতেও এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অনেক লাভবান হতে পারে। এখানে ইতোমধ্যে ব্যাপক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ঘটছে। ভবিষ্যতে আরো ঘটবে।

প্রতিবছর সুন্দরবনে বিশেষ করে শীত মৌসুমে প্রায় ১ লাখ দেশি-বিদেশি পর্যটক সুন্দরবন ভিজিট করে। এদের প্রায় ৮০% বাগেরহাট মোংলা দিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। সুতরাং বাগেরহাট জেলার ষাটগম্বুজ মসজিদ, মোংলা এবং সুন্দরবন নিয়ে হতে পারে বাংলাদেশের একটি অন্যতম পর্যটন জোন।

জিয়াউল হক হাওলাদার: পর্যটন গবেষক এবং মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ziabpc@gmail.com

খ্যাতিমানদের তরুণবেলাঃ কবি শামসুর রাহমান

প্রত্যয় জসীম

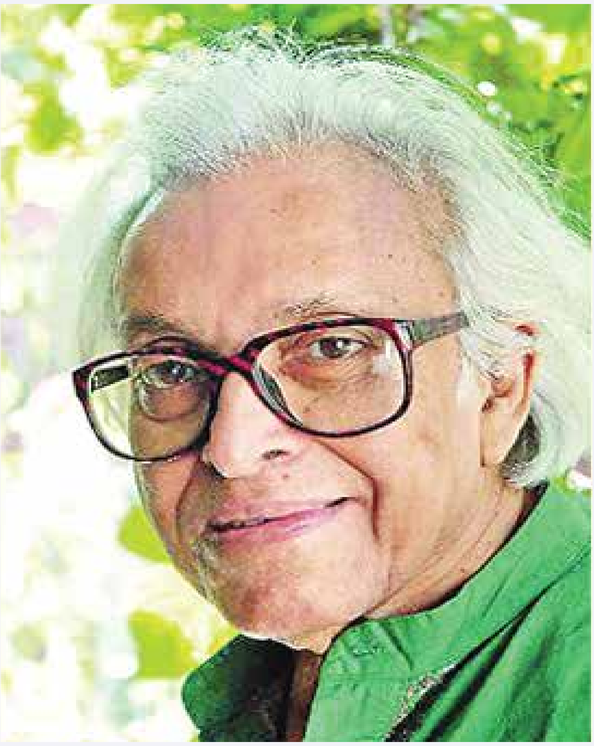

শামসুর রাহমান স্বাধীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা। নাগরিক কবি, প্রেমের কবি, স্বাধীনতার কবি এমন বহুমাত্রিক অভিধায় অভিষিক্ত তিনি। নজরুল পরবর্তী আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বাঙালি জাতিসত্তার প্রধান কবি শামসুর রাহমান। তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার পালন বাংলাদেশের সমাজ জীবনে শিল্পীর স্বাধীন ও অকুতোভয় চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। কিন্নরকণ্ঠ এই কবি আধুনিক বাংলা কাব্যের সমুন্নত ভূখণ্ডের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। চিরায়ত বাংলা কবিতায় অমরবৃন্দের সঙ্গে তিনিও থাকবেন দ্যুতিময় তারা হয়ে।

১৯২৯ সালের ২২শে অক্টোবর বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক বাড়ি ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম, সাত ভাই ছয় বোনের মধ্যে শামসুর রাহমান চতুর্থ মা আমেনা বেগম। ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে তিন বছর পড়াশুনা করেও পরীক্ষা না দিয়ে ১৯৫৩ সালে পাস কোর্সে বি.এ. পাস করেন। কিন্তু এম.এ. শেষপর্বের পড়াশুনা করেও পরীক্ষা দেননি। ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই জোহরা বেগমকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। কবিতা লেখা শুরু করেন ১৯৪৯-এ। তখন বয়স ১৯ বছর। প্রথম কবিতা প্রকাশিত নলিনী কিশোর গুহ সম্পাদিত ঢাকার *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*'য়। কবিতার নাম ছিল উনিশশো উনপঞ্চাশ। দীর্ঘ ৫০বছর একব্রতী কাব্যচর্চায় সমর্পিত এই কবির এ যাবৎ প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪৩টি। অনূদিত বই ৫টি। উপন্যাস ৩টি, শিশু-সাহিত্য ৩টি এবং প্রবন্ধের বই একটি। পাঠক নন্দিত কবি আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭) ও অন্যান্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

১৯৫৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা। এরপর তুরস্ক ১৯৬৭। ১৯৭৩ সালে পুশকিন উৎসব উপলক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে। বার্মা ১৯৭৭-এ। পশ্চিম জার্মানি ১৯৭৮: যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৯। সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে ১৯৮০ সালে গণচীন। ১৯৮১ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিউইয়র্ক। ১৯৮২ সালে মিতসুবিশি পুরস্কারের জন্য জাপান এবং ১৯৮৩ সালে আই.সি.সি.আর-এর আমন্ত্রণে ভারত সফর করেন। কাব্যচর্চার পাশাপাশি জীবিকারূপে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন তিরিশ বছর ধরে। ১৯৫৭ সালে *মর্নিং নিউজ*-এ শুরু। মাঝে দুবছর (১৯৫৭-১৯৫০) রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা শাখার অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন *দৈনিক পাকিস্তানে* যোগ দেন এবং ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত *দৈনিক বাংলার* সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি *দৈনিক বাংলা* ও সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র সম্পাদক ছিলেন। তিনি উল্লিখিত পত্রিকা দুটির প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন ৬-১২-৮৭ তারিখে।

ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে অনারারি ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

প্রিয় পাঠক তাঁর তরুণবেলায় ফিরে যাই–

আমাদের সময়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ছিল ভালো। আমার মনে পড়ে আমার সাবসিডিয়ারি ছিল বাংলা। আমার একজন শিক্ষক ছিলেন বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী, ক্লাশ শেষ হওয়ার পরও আমি রুমে থাকতাম তাঁর সাথে সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতাম। আমি ছোটো কিংবা ছাত্র বলে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। বরং খোলা মনে আলোচনা করতেন। যেন আমি তার সমবয়সি।

আমি ইংরেজিতে অনার্সের ছাত্র ছিলাম। আমাদের রোমান্টিক কবিতা পড়াতেন ড. আমিয় ভূষণ চক্রবর্তী। তিনি আমাদের

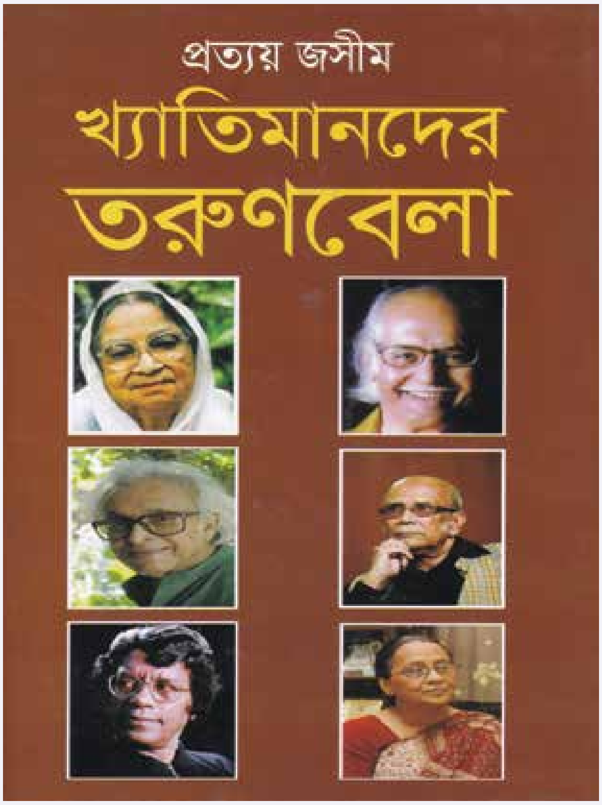

খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল সমৃদ্ধ। তিনি আমাকে তা ব্যবহার করতে দিতেন। প্রায়ই সেখানে আমি আহারও করতাম। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে যখন কবিতা লিখতে শুরু করি। ১৯৪৯ সালে আমার কবিতা ছাপাতে শুরু হয়, তখন তিনি আমাকে উৎসাহিত করতেন।

একদিন তাঁর বাসায় যাচ্ছিলাম। পথে ফুলবাড়িয়া হয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ফুলবাড়িয়া কিছু রেলের ওয়াগন ছিল সে ওয়াগনে অবাঙালি ছিল। ড. আমির ভূষণ চক্রবর্তী বললেন আমরা দুজনেই বিষয়টি নিয়ে কবিতা লিখি। আমরা দুজনেই এ বিষয়টা নিয়ে কবিতা লিখি। একদিন এক ঘরোয়া সাহিত্য সভায় তা পড়া হলো। আমার শিক্ষক বললেন, আমার কবিতাটাই ভালো হয়েছে। কবিতাটি পত্রিকায় ছাপা হয় এবং আমাকে ২৫ টাকা সম্মানী দেওয়া হয়। পরে কবিতাটি কলকাতায় অনীল কুমার সিংহ সম্পাদিত নতুন সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতাটির নাম ছিলো 'ওয়াগনে কয়েকটি দিন'। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে আমাদের সময় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল। আমি আজও তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

বন্ধুবান্ধবের সম্পর্ক

খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, টান ছিল, মায়া ছিল, ভালোবাসা ছিল।

রাজনীতির ধরণ

তখন মুসলিম লীগের দাপটই ছিল তবে একটা প্রগতিশীল রাজনীতি প্রবল হয়ে উঠে। ছাত্র ইউনিয়ন খুব সক্রিয় ছিল সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা ছিল। আমরা সেখানে কবিতা পাঠ করতাম।

প্রেম তখনও ছিল। তবে মেয়েদের সংখ্যা কম ছিল। এখনকার মতো সহজে মেলামেশা করতে পারতাম না। এই সহজে মেলামেশাকে আমি ভালোভাবে দেখি। এর মাঝে কোনো আবীলতা নেই।

নস্টালজিক স্মৃতি

মধুদার কেন্টিনে আর আমতলা বেলতলা এ সবের কথা কোনোদিন ভুলব না। আমতলায় প্রচুর আড্ডা দিয়েছি এসব স্মৃতি মোছার নয়। পড়াশোনার বাইরে কবিতা লিখতাম সাহিত্য আড্ডা দিতাম, সিনেমা দেখতাম, তখন নার্গিস, মধুবালা, পৃথীরাজ, দীলিপকুমার এদের অভিনয় ভালো লাগত মানসী, মুকুল, পিকচার হাউজ, ব্রিটানিয়া, গুলিস্তান, নাজ- এসব হলে ছবি দেখতাম।

আমাকে জীবনধারনের প্রয়োজনে তেমন স্ট্রাগল করতে হয়নি। আমার বাবার অবস্থা সচ্ছল ছিল।

তরুণ বয়সে *মর্নিং নিউজে* পরবর্তীতে *দৈনিক পাকিস্তানে* কাজ করি। যা ছিল আমার ভুল সিদ্ধান্ত।

আমি মনের দিকে তাকিয়েছি আমার মন আমাকে পরিচালিত করেছে। তবে আমি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি এবং কবিতা লিখব এটি ছিল সব সময়েই আমার প্রধান কাজ। মন আমাকে সময় সময় পরিচালিত করত।

প্রেম সম্পর্কে তিনি বলেন- ভালোবাসা হলো নির্ভেজাল ও অনাবিল আনন্দের। সে ভালোবাসা হতে পারে একজন বন্ধুর প্রতি, প্রেমিক কিংবা প্রেমিকার প্রতি। একজন ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে, তার প্রেমিকাকে ভালোবাসে। আবার প্রেমিকাকে ভালোবাসতে গিয়ে ভালোবাসে দেশকে। তখন ব্যক্তিপ্রেম ও দেশপ্রেম একাকার হয়ে যায়। আজকের তরুণরা অনেক বেশি ভাগ্যবান। আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারা পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিতে পারে। আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সে সুযোগ ছিল না। বিশেষ করে মেয়েরা ছিল অবরুদ্ধ। এখন তরুণ-তরুণীদের মাঝে কেবল প্রেমের সম্পর্ক নয়, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে উঠছে। এটি অবশ্যই ভালো বলে আমি মনে করি।

এ প্রজন্মের জন্য আপনার উপদেশ

উপদেশ দেওয়া পছন্দ করি না। তবে আমি মনে করি, যারা তরুণ তারা তাদের সমাজকে প্রগতিশীল এবং মানব কল্যাণকামী করে তোলার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে। তাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে দেশে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধারা জোরদার হতে পারে।

প্রত্যয় জসীম: কবি, প্রাবন্ধিক ও সভাপতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ফাউন্ডেশন

জামদানি বাংলার বয়নশিল্পের ঐতিহ্য

মিনা রহমান

জামদানি, যে শাড়ির নকশায় প্রাণ পায় কারিগরদের শিল্পভাবনা। জামদানি বয়নশিল্প– বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপাদান । ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি অর্জনের পর এটি এখন আর শুধু বয়নশিল্প নয়, দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। জামদানি মূলত ইতিহাসখ্যাত ঢাকাই শাড়ি মসলিনেরই একটি প্রজাতি। জামদানি ঢাকা জেলার বিশেষ ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে জড়িয়ে রয়েছে জামদানি শিল্পের নাম। জামদানি বাংলাদেশের জিআই পণ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ শিল্পের ভেতরের যে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যে, তার ধারক হয়ে আজও জনপ্রিয়তায় অনন্য হয়ে আছে।

সেই মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত আজকের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নিয়ে গোটা অঞ্চলটাই ছিল বৈশ্বিক বস্ত্রবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। অমসৃণ, মোটা বাফতা থেকে শুরু করে মিহিন মখমল পর্যন্ত তৈরি হয়েছে এই বাংলার গ্রামে গ্রামে, স্থানীয় বয়নশিল্পীদের নৈপুণ্যে। এই ভূখণ্ডে হাতে কাটা সুতায় হস্তচালিত তাঁতে তৈরি বস্ত্রের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। কৌশলগত নৈপুণ্য, সূক্ষ্মতা, বয়নদক্ষতা, নান্দনিক সৌন্দর্য আর গুণগত মানে সেই বস্ত্র ছিল তুলনাহীন। সেই কাপড়ই অতীতে মসলিন নামে বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাচীন বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্য জামদানি বুনন এবং এর নকশা। জামদানি বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এদিকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সুরক্ষা আইন জামদানিকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ইউনেস্কো বাংলাদেশের জামদানি বয়নশিল্পকে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই স্বীকৃতির ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বয়নশিল্পীদের সম্পৃক্ত করে জামদানি সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব। এমনকি জামদানির বয়ন ও বিপণন ব্যবস্থাসম্পর্কিত জ্ঞান তাঁতিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও যায়।

জামদানি নকশা সূচিকর্মে ফুটিয়ে তোলা হয় না, ছাপাও হয় না। এর বুনন এক বিস্ময়কর বয়নকৌশল, যা শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। এই নকশা সরাসরি তাঁতে বোনা। স্বচ্ছ জমিনে অস্বচ্ছতার মোহনীয়তায় প্রতিটি নকশাই স্বতন্ত্র, অনন্য আর সূক্ষ্ম। নকশাগুলোতে দেখা যায় জ্যামিতিক প্যাটার্নের ব্যবহার।

বাবা থেকে ছেলে, ওস্তাদ থেকে সাগরেদ– শ্রুতি ইতিহাস আর হাতেকলমে শেখার মধ্য দিয়ে পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই বয়নশিল্প। একেবারে সহজ ও আদি গর্ত-তাঁতে (পিট লুম) কাপড় বোনার সময় বয়নশিল্পীরা নকশা তৈরি করেছেন। এর নেপথ্যে রয়েছে এই শিল্পীদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অর্জন করা নিরন্তর সূক্ষ্ম কাজের অনুশীলন। স্মৃতি এবং মেধার বিস্ময়কর ধারণক্ষমতা।

জামদানির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, জমিনের সুতার ঘনত্ব ও সূক্ষ্মতার চেয়ে নকশায় ব্যবহৃত সুতার আনুপাতিকভাবে ঘনত্ব বেশি আর সূক্ষ্মতা কম। আবার কাপড়ের মানের ওপর নির্ভর করে নকশার সুতা জমিনের সুতার চেয়ে চার গুণ বেশিও হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শাড়ির জমিনে অলংকরণের মোটিফগুলো খুবই জোরালো আর অলংকরণে ব্যবহৃত সুতার উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকে। এসব নকশা আর মোটিফের উপস্থিতি আর বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জামদানিকে ভৌগোলিক বিশেষত্বে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। বেনারসি, টাঙ্গাইল, রাজশাহীর গরদ, পাবনার শাড়ি, সাউথ কটন, মুর্শিদাবাদী সিল্ক ইত্যাদি স্থানের নামে আর গাদোয়াল, জামদানি, চুন্দ্রি, মহেশ্বরী ইত্যাদি বয়নশিল্পীদের দেওয়া নামেই প্রচলিত। অতীতে জামদানি তৈরিতে একটা বিষয় খুব গুরুত্ব পেত, তা হলো জমিনের স্বচ্ছতা আর নকশা বা অলংকরণের ঘনত্ব। সে সময়ের মসলিন জামদানি কাপড়ের নিচে যদি হাতের তালু প্রসারিত করে রাখা হয়, দেখা যাবে, নকশার নিচের অংশটুকু ছাড়া বাকি জমিনের অংশের নিচের হাতের তালু প্রায় দৃশ্যমান।

জামদানি তৈরিতে সুতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অতীতে কার্পাস তুলা থেকে হাতে কাটা সুতা ব্যবহার করা হতো। ১৮-১৯ শতকে উচ্চমানসম্পন্ন তুলা থেকে হাতে কাটা সুতার প্রচলন ঘটে। বর্তমানে মিলের সুতার সহজলভ্যতার কারণে হাতে কাটা সুতার প্রচলন নেই বলা যায়। আগে যেখানে ভালো জামদানি তৈরির জন্য ২০০-২৫০ কাউন্টের সুতা ব্যবহার হতো, সেখানে এখন তাঁতিরা বাজার থেকে নির্ধারিত কাউন্টের সুতা কিনে ব্যবহার করেন। জামদানি বয়নকালে প্রথমে বয়ন করা হতো আঁচল, যা চওড়ায় ছিল ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি, তারপর জমিনের

বিস্তৃত অংশ। শেষে বোনা হতো ভেতরের দিক। বর্তমানে প্রথমে বোনা হয় গুড়ি বা শুরুর দিক, এরপর পাড়, আঁচল, পাট্টা, ছিলাই। আগে শাড়ির মাপ হতো সাড়ে ১০ হাত পর্যন্ত। তখন ব্লাউজ পিসের প্রচলন ছিল না। ব্লাউজ পিসের সংযুক্তি ঘটেছে ৩০-৪০ বছর আগে মাত্র। বর্তমানে দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ হাত হয়ে থাকে।

জামদানি বুননের মূল শক্তিই হলো সুতা। জামদানি শাড়ির মূল আকর্ষণ নকশা বা মোটিফ। এ নকশা সাধারণত কাগজে এঁকে নেওয়া হয় না। জামদানির শিল্পীরা নকশা আঁকেন সরাসরি তাঁতে বসানো সুতায় শাড়ির বুননে বুননে। তারা এমন পারদর্শী যে, মন থেকে ভিন্ন ভিন্ন নকশা আঁকেন। পুরো জমিনে নকশা করা একটি শাড়ি তৈরি করতে ন্যূনতম সময় লাগে দুই মাস।

অতীতে তাঁতি নিজেই ছিলেন বয়নশিল্পী আর নকশাবিদ। রং, প্যাটার্ন, সুতার ধরন সবই হয়েছে তার একক সিদ্ধান্তে। তাদের মনের মাধুরী আর শিল্পিত মানসে গড়ে ওঠা পুরানো জামদানিগুলো এখনো বিস্ময় আর গর্বের উদ্রেক করে। এখন বাজার আর ক্রেতার ধরন পাল্টেছে, পরিবর্তন এসেছে রুচিতেও। তাই হাল আমলের ফ্যাশনকেও বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়, যাতে প্রভাব ও সিদ্ধান্ত থাকে পৃষ্ঠপোষকের, ক্রেতার। আর তাই বর্তমানে জামদানির পুরো নির্মাণকাজে বয়নশিল্পী বা তাঁতি ছাড়াও আরো দুটি দল কাজ করে উপকরণের সঠিক প্রস্তুতি ও কাপড় বোনার সব প্রয়োজন গুছিয়ে দেওয়ার জন্য একটি দক্ষ দল বা টিম থাকে, আবার তৈরি কাপড় বাজারজাতের জন্য থাকে আরেক দল। কখনো আবার একই দল এ ভাগ দুটোর দায়িত্ব পালন করে। তবে সবচেয়ে বড়ো কাজ নকশা, যা জামদানির প্রাণ। এ নকশাগুলো আগে কোথাও খসড়া করা থাকে না বা এঁকে রাখাও হয় না। পুরোটাই থাকে তাঁতির মনে, মাথায় আর আঙুলের ডগায়। জামদানি শাড়ির আগের সব বিখ্যাত ও অবিস্মরণীয় নকশা ও বুননের অনেকগুলোই বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। নবীন কারিগররা অধিকাংশ নকশাই বুনতে জানেন না। সুতি, সিল্ক ও হাফ সিল্কের জামদানি শাড়ি তৈরি করা হয়। তেরছা, জলপাড়, পান্না হাজার, করোলা, দুবলাজাল, সাবুরগা, বলিহার, শাপলা ফুল, আঙ্গুরলতা, ময়ূরপ্যাচপাড়, বাঘনলি, কলমিলতা, চন্দ্রপাড়, ঝুমকা, বুটিদার, ঝালর, ময়ূরপাখা, পুইলতা, কল্কাপাড়, কচুপাতা, প্রজাপতি, জুঁইবুটি, হংসবলাকা, শবনম, ঝুমকা, জবাফুলসহ কত নামের যে জামদানি আছে।

জামদানি শাড়ির প্রচলন করেছিলেন মুঘল সম্রাট। তবে আজকের জামদানি শাড়ি বাংলার এ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক হলেও এটি কিন্তু পুরোপুরি দেশীয় ঐতিহ্যেরও নয়। বরং মুঘল ও পারসিক ঐতিহ্যের এক সুন্দর মেলবন্ধন জামদানি শাড়িতে মিশে আছে। জামদানি একটি বংশানুক্রমিক কারুশিল্প। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার বেশ কিছু গ্রাম এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলার কয়েকটি গ্রামে যুগ যুগ ধরে জামদানি তৈরি হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ধারক জামদানিকে টিকিয়ে রাখতে হলে সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরি। এর ডিজাইন ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা যেমন জরুরি, তার চেয়ে বেশি জরুরি তাঁতিদের পৃষ্ঠপোষকতা। কারণ ভালো জামদানি তৈরিতে যে সময় লাগে সে তুলনায় টাকা খুব কম পান তাঁতিরা। তাই তাঁতিদের আর্থিক সচ্ছলতা আনার দিকে বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মিনা রহমান: প্রাবন্ধিক

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা উন্নয়নে বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশের আইসিটি বিভাগের আওতাধীন এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং গাম্বিয়ার দু'টি প্রতিষ্ঠান মিনিস্ট্রি অব পাবলিক সার্ভিস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস, পলিসি কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড ডেলিভারি ও মিনিস্ট্রি অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড ডিজিটাল ইকোনমি তথ্যপ্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্স সহযোগিতা সম্প্রসারণে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। ২৯শে জানুয়ারি গণমাধ্যম থেকে এ তথ্য জানা যায়। গত বছর গাম্বিয়া বাংলাদেশের মাইগভ প্ল্যাটফর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে যে অংশীদারিত্বের সূচনা হয়েছিল, এই চুক্তির মাধ্যমে তা আরো এগিয়ে নেওয়া হলো।

অনুষ্ঠানে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, দুই দেশের এ উদ্যোগ 'গ্লোবাল সাউথ'ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। জনবান্ধব জনসেবা প্রদানে উপযোগী সল্যুশন গড়ে তোলার দিকে উভয় দেশই এগিয়েছে যা সাধুবাদ পাওয়ার দাবি রাখে।

আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী নাগরিক অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপর জোর দিয়ে বলেন, ডিজিটাল সিস্টেমের গুরুত্ব তখনই পায় যখন তা সহজে সেবা প্রদান করে। প্রক্রিয়ার শেষে নাগরিক কী পাচ্ছেন, কত দ্রুত, কত সহজভাবে এবং কতটা ন্যায্যভাবে সেবা দেওয়া হচ্ছে; সেই বিষয়গুলোতে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

গাম্বিয়ার স্থায়ী সচিব পাতেহ জাহ বলেন, আমাদের সফরের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি শেখা। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে দেখতে এসেছি কাজ কীভাবে হয়, ই-গভর্নেন্স সিস্টেম কীভাবে তৈরি ও পরিচালিত হয়, আর কীভাবে এগুলো মানুষের কাজে লাগে। এই এমওইউ আমাদের শেখার এ ধারাকে কাঠামোবদ্ধ করবে এবং দেশে ফিরে তা বাস্তব উন্নয়নে রূপ দিতে সহায়তা করবে।

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

আমাদের চলচ্চিত্রে ভাষা আন্দোলন

আপন চৌধুরী

ভাষা আন্দোলন বাঙালীর জাতীয় জীবনের এক মহত্তম অধ্যায়। অথচ সেই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০), বাঙলা (২০৬), ফাগুন হাওয়ায় (২০১৯) ছাড়া তেমন কোনো চলচ্চিত্র নেই। মাতৃভাষার জন্য রক্তক্ষয় কিংবা আন্দোলনের নজির পৃথিবীতে আর নেই। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকে বলা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় বিজয় অর্জনের মূল সূত্র। প্রথমে রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং পরে সার্বভৌমত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে আজকের মাথা উঁচু বাংলাদেশ। সম্প্রতি পৃথিবীব্যাপী ইতিহাস ও ঘটনানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ বেড়েছে। পাশের দেশ ভারতের নির্মাতারা তাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সময় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং সেগুলো ব্যবসা সফল হচ্ছে। অথচ ভাষা আন্দোলনের ৭৫ বছর পূর্তিতে আমাদের হাতে রয়েছে মাত্র তিনটি চলচ্চিত্র।

১৯৫২ সালে মহান ভাষার বিপ্লব থেকেই বাঙালির সব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। সমগ্র জাতিকে এভাবে একাত্মা হতে এর আগে কখনো দেখা যায়নি। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন, এমনকি ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনেরই ফসল। সেই বিপ্লবী চেতনাই আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়, বুক ফুলিয়ে বাঁচতে শেখায়। যে আন্দোলন বাঙালির সব সাহস, শক্তি ও প্রেরণার প্রধানতম উৎস, সেই মহান অর্জনকে নিয়ে আমাদের চলচ্চিত্রাঙ্গনে নেই উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো শিল্পসৃষ্টি।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান সংবলিত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সেই প্লাকার্ড বাঙালি জাতির স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল। বছর ঘুরে একুশে ফেব্রুয়ারি সেই বার্তা নিয়ে হাজির হয় বিশ্বের নজরে। কারণ দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। জহির রায়হান একুশে ফেব্রুয়ারি নামে আরও একটি সিনেমা নির্মাণের উদ্যেগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতার কারণে সেটি আর নির্মিত হয়নি। এরপর ১৯৭০ সালে গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে জীবন থেকে নেয়া নিয়ে হাজির হলেন জহির রায়হান। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি এ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এটিই একমাত্র চলচ্চিত্র যাতে প্রভাতফেরি, ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদমিনারে বিভিন্ন সংগঠনের পুষ্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য, সমকালীন গণ-আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, রাজনীতি, পুলিশি নির্যাতন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ও ঘটনা তুলে ধরা হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত সেটি নির্মাতা এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক ঘটনা ও বক্তব্য থাকার কারণে পাকিস্তানের সামরিক সরকার প্রযোজক-পরিচালক জহির রায়হানকে নানাভাবে হয়রানি ও সেন্সর সার্টিফিকেট না দেওয়ার পাঁয়তারা করেছিল। নির্দিষ্ট তারিখে ছবিটি মুক্তি না পাওয়ার কারণে সচেতন দর্শক ও জনসাধারণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা স্লোগানসহকারে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সিনেমা হল আক্রমণ করে। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সামরিক সরকার সেন্সর সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হয়েছিল। জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটি মুক্তির পরের বছর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। দেশ স্বাধীনের পরের মাসেই মারা যান জহির রায়হান। তারপর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও ভাষা আন্দোলন নিয়ে সেভাবে কেউ ভাবেননি।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফার লেখা উপন্যাস ওংকার অবলম্বনে নির্মিত হয় বাংলা চলচ্চিত্র। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র এ ছবিটি। ফাগুন হাওয়ায় চলাচ্চিত্রটি টিটো রহমানের গল্প 'বউ কথা কও' অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে। সরকারিভাবে হৃদয়ে একুশ ও বায়ান্নর মিছিল নামে ডকুমেন্টারি উল্লেখযোগ্য।

'অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র' নামক চলচ্চিত্রবিষয়ক এক প্রবন্ধে জহির রায়হান লিখেছেন, সিনেমা মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রকাশের এবং বিকাশের এক নতুন মাধ্যমের সন্ধান দিয়েছে, যার শক্তি অপরিসীম। সিনেমা হলো কবিতা। সিনেমা হলো উপন্যাস। সিনেমা হলো সংগীত। সিনেমা হলো পেইন্টিং। সিনেমা হলো নাটক। সিনেমা হলো বিজ্ঞান। সিনেমা হচ্ছে সবকিছুর সমষ্টি। এ এক যৌথ কলা। অথচ কোনো একটির একক অস্তিত্ব এখানে নেই। সবকিছু ভেঙেচুরে, সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক বৈজ্ঞানিক শিল্পকর্ম।

একটি পরিবারের কাহিনি দিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার যেমন, তেমনি বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেও মূর্ত করেছেন। জহির রায়হান এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯৬৭ সালে, আর ১৯৭০ সালে নির্মিত জীবন থেকে নেয়া সিনেমায় তার এই ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন পুরোদমে। সবকিছু ভেঙেচুরে, সবকিছুর সমন্বয়ে এক পরিবারের কাহিনির আড়ালে বিভিন্ন রূপক ও মন্তাজের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপই ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিবারের প্রধান কর্তৃক (রওশন জামিল) যেন সাক্ষাৎ আইয়ুব খানের প্রতিভূ হয়ে উপস্থিত হন, যিনি তুচ্ছার্থে বলতে পারেন একুশে ফেব্রুয়ারি? সেটা আবার কী?

এ যেন পাকিস্তানি স্বৈরশাসককেই দাঁড় করানো হলো জনতার আদালতে। আনোয়ার হোসেন অমর একুশে লেখা পোস্টার লেখনির শটের মাধ্যমে শুরু হয় জীবন থেকে নেয়া। প্রভাতফেরির দৃশ্যধারণে জহির রায়হান বিভিন্ন প্রতিবাদী পোস্টারের ক্লোজ আপের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত চিরচেনা একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' আবহ সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিসিলের লং শট থেকে প্যানিং করে ক্লোজআপে দেখা যায় মায়ের কোলে ভয়ার্ত শিশুর ছবি, যাদের দিকে এগিয়ে আসছে শকুনের থাবা। এর পর আসে চোখবাঁধা ছাত্রনেতাদের ছবি, শহিদ ভাষা সৈনিকদের নাম ফলক।

জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে অন্যান্য দৃশ্যেও মন্তাজের অপূর্ব ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। রওশন জামিলের শত বাধা উপেক্ষা করে রাজ্জাক-সুচন্দা এবং শওকত আকবর-কাজী রোজীর রোমান্স ও মিলনের দৃশ্যায়নে জহির রায়হান প্রবহমান সময়কে প্রকাশ করেন বিভিন্ন স্থিরচিত্রের মাধ্যমে। যেমন- ক্লোজআপে বিছানার উপর শুধু দুই জোড়া পায়ের ছন্দ, হাতের ওপর হাত এবং তার বিপরীতে এক্সট্রিম বিগ শটে রওশন জামিলের অগ্নি চোখে যেন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের অগ্নি চোখ প্রতিস্থাপিত হয়, যা উপেক্ষা করেই বাঙালি জেগে উঠেছিল নিজস্ব সংস্কৃতিতে ও মুক্তির সন্ধানে। ঘরের দেয়ালজুড়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোস্টার দেখে রওশন জামিলের হুংকারও আমাদের পাকিস্তানি শাসকদের হুংকারকেই মনে করিয়ে দেয়।

জেলে থাকা রাজবন্দিদের কণ্ঠে নজরুলের 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানটির সাথে উড়ন্ত পাখির দিকে ছুটে আসা তীরের ছবির মন্তাজে অনেক কথাই বলা হয়ে যায়। আবার 'দুনিয়ার যত গরিবকে আজ জাগিয়ে দাও' শীর্ষক গণসংগীতের দৃশ্যের পুরোটাই ক্লোজআপে ধারণ করা হয়, যেখানে মাঝেমধ্যেই শুধু হাতিয়ারের ছবি পুরো ফ্রেমে থাকে। হাতিয়ার কাঁধে শ্রমিকদের মুখের অভিব্যক্তিতে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির দাবি আরও জোরালোভাবে ফুটে উঠে যেন, ঠিক যেমন খান আতাউর রহমানের কণ্ঠে গাওয়া 'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে' গানটি স্বাধীন জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটি দেখতে হয় গভীর নিমগ্নতায় এবং তার ভাষা বুঝতে হয় চলচ্চিত্রতত্ত্বের অনুভব ও অনুধাবনে। তাই বোধ হয় চলচ্চিতের শুরুতেই জহির রায়হান লিখেন, 'একটি দেশ-একটি সংসার-একটি চাবির গোছা-একটি আন্দোলন-একটি চলচ্চিত্র'।

তৌকির আহমেদ পরিচালিত ফাগুন হাওয়ায় মফস্বলের প্রেক্ষাপটেই হাজির করেছে গোটা রাষ্ট্রকে 'সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, তোমারা আমাদের দোয়া কর আশীর্বাদ কর। আমরা যেন এই দেশটাকে সুন্দর গড়ে তুলতে পারি। এ দেশের প্রতিটি ঘরে-সংসারে যেন সুখ ও শান্তি এনে দিতে পারি। এ দেশের প্রতিটি ঘর থেকে যেন ঈর্ষা-বিদ্বেষ-লোভ-লালসা-হিংসা-ঘৃণা-অবিচার ও অত্যাচারের ক্লেদ যেন চিরতরে মুছে দিতে পারি।

ফাগুন-হাওয়ায় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে নির্মিত কোনো সিনেমা না হলেও এটা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় নির্মিত এক চলচ্চিত্র। জহির রায়হান যেমন এক পরিবারের কাহিনির আড়ালে তুলে এনেছেন তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সেখানে তৌকির আহমেদ একটি মফস্বল থানার কাহিনির বিন্যাসে আমাদের ভ্রমণ করিয়ে আনেন ভাষা আন্দোলনের চেতনায় ও সংগ্রামে।

জহির রায়হানের জীবন থেকে নেয়া যেখানে শুরু, শেষ দৃশ্যে সেখানেই গিয়ে মিশেছে যেন ফাগুন হাওয়ায় পরিচালক তৌকির আহমেদ পাকিস্তানি শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করেন জামসেদকে। এই চরিত্রকে একটু বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর একটি পরিচয় পাওয়া যায়, যা নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী করে তুলবে।

আপন চৌধুরী: চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা ও লেখক

অতিরিক্ত ওএমএস কর্মসূচির আওতায় ভরতুকি মূল্যে চাল বিক্রি

চালের বাজারমূল্য স্থিতিশীল রেখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা দিতে ২২শে জানুয়ারি থেকে দেশের ৪১৯টি উপজেলায় দৈনিক ১ মে. টন করে চাল প্রতি কেজি ৩০ টাকা দরে অতিরিক্ত ওএমএস কর্মসূচির আওতায় বিক্রি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বের ওএমএস (সাধারণ) কর্মসূচি যথানিয়মে চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত ওএমএস কর্মসূচি সাধারণ ওএমএস কর্মসূচির পাশাপাশি চলমান থাকবে। ওএমএস (সাধারণ) কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৫২টি জেলা সদর পৌরসভা, ১৫টি শ্রমঘন উপজেলা এবং ৫টি শ্রমঘন পৌরসভাসহ মোট ১ হাজার ৮১ টি কেন্দ্রে দৈনিক ১ হাজার ৪১৭ দশমিক ৫ মে. টন আটা (প্রতি কেজি খোলা আটা ২৪ টাকা এবং ২ কেজি প্যাকেট আটা ৫৫ টাকা দরে) এবং ১ হাজার ১৭৫ মে. টন চাল (প্রতি কেজি ৩০ টাকা দরে) ভরতুকি মূল্যে বিক্রি করা হয়।

পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও ইদানীং দেশের কিছু কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে সরু চালের বাজার দর বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ সকল এলাকায় নিয়মিত বাজার মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। তবে মাঝারি ও মোটা চালের বাজার দর স্থিতিশীল রয়েছে।

প্রতিবেদন: পঙ্কজ রায়

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে মহাপরিচালক বক্তব্য দিচ্ছেন

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০২৬

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) নিয়মিত কাজের পাশাপাশি কর্মচারীদের আচার-আচরণ, দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে। এছাড়া নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ:

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

৯ই ফেব্রুয়ারি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে বাৎসরিক ৬০ জনঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিল– 'সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯'; 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'; 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯' এবং 'সরকারি কর্মচারীদের অফিসিয়াল ডেকোরাম ও শিষ্টাচার'।

সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ বিষয়ে মহাপরিচালক খালেদা বেগম তার কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরবর্তী সেশন সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ পরিচালনা করেন মো. জাহিদুল ইসলাম, পরিচালক (চলচ্চিত্র)। তিনি কর্মচারীদের শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং আপিল সংক্রান্ত বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন।

এছাড়া সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারীদের অফিসিয়াল ডেকোরাম ও শিষ্টাচার বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন মুহা. শিপলু জামান, পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা)। তিনি আচরণবিধি, দাপ্তরিক শালীনতা ও পেশাগত শিষ্টাচার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিধিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকাশনার মানোন্নয়নে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রকাশনার মানোন্নয়নে অংশীজনদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি দপ্তরের দ্বিতীয় তলায় সম্মেলন কক্ষে এ আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সম্পাদক (সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ) শাহিদা সুলতানা।

সভায় 'সচিত্র বাংলাদেশ', 'নবারুণ', 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি' এবং 'অ্যাডহক' প্রকাশনার প্রথিতযশা লেখক, কথাসাহিত্যিক ও কবিগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় প্রকাশনার গুণগত মান উন্নয়ন, বিষয়বস্তুর আধুনিকায়ন এবং পাঠকবান্ধব উপস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে তথ্যবহুল, সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী লেখার কৌশল নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা মতামত প্রদান করেন। নিয়মিত প্রকাশনা 'নবারুণ', 'সচিত্র বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি'-এর বিষয়বস্তু, প্রচ্ছদ

প্রকাশনার মানোন্নয়নে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় মহাপরিচালক লেখকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন

নকশা, ভাষার মান এবং মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

এছাড়া দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশনাসমূহকে আরও সমৃদ্ধ ও গবেষণানির্ভর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রকাশনা বিতরণ ব্যবস্থা আরও কার্যকর ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানোর কৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। সভায় উন্মুক্ত আলোচনায় লেখকবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীরা প্রকাশনার আধুনিকায়ন, নান্দনিক উপস্থাপনা এবং পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। উন্মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা) মুহা. শিপলু জামান। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ৭০ জন লেখক অংশগ্রহণ করেন এবং সকল

অংশগ্রহণকারী লেখকবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি র‍্যালিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সকল দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন

লেখককে মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন

২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অধীনস্ত সকল দপ্তর-সংস্থা প্রভাতফেরি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন এবং ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৬-এ অংশগ্রহণ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমির যৌথ আয়োজনে এ বছর ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৬' শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। বইমেলা চলবে আগামী ১৬ই মার্চ পর্যন্ত।

প্রতিবারের মতো এবারও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) অংশগ্রহণ করেছে। অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ, ডিএফপি

তিনশো টাকার সাইকেল

আবু তৈয়ব মুছা

পাঁচ-ছয় কিলোমিটার পায়ে হাঁটা কাঁচা পথ পেরিয়ে মাধ্যমিকের পাঠ অবশেষে চুকালো। এই মাধ্যমিক পার হওয়াটা একেবারে সহজ ছিল না। রিকশা-ভ্যান-গরুর গাড়ির ধুলোমাখা পথের সাথে মানুষেরও এই একই পথ। সারা রাস্তাজুড়ে সাদা ধুলোর বাহাদুরি। রাস্তায় কিছু জায়গায় ইট বিছানোর কাজের সুনাম যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে জানান দেয় ধুলো, এই ধুলোমাখা পথ আমাদের।

ধান-চাল বোঝাই গরু-মহিষের গাড়ি চলাচল যেমন এজন্য দায়ী, তেমনি আবার সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম হতে মহিমাগঞ্জ চিনিকলে আঁখ পরিবহণের জন্য গাড়িগুলোও কম দায়ী ছিল না। দিনরাতে যেন তাদের অঘোষিত রাস্তা দখলের মহড়া।

এগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে চলা, আর নিত্য-নতুন না এর সাথে সখ্যতা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হতে বাধ্য করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে থাকাকালীন ঐভাবে মনে দাগ না কাটলেও দাগ কাটা শুরু হয়েছে মাধ্যমিকের পর্যায় থেকে।

কোনোদিন পানি-পান্তা আবার কোনোদিন রুটির সাথে শুকনা মরিচ পেঁয়াজ চাটনি করে খাওয়া। এরকম জীবনের কথা কজন ভুলে যায়? ভুলতে পারে কি মানুষ? ঘরে সে রুটির আটাও শূন্য। তা হলে রুটি?

নিতু,

> – ছেলেকে পাঠালাম, দুই কেজি আটা দিও। বিকেলে গোবিন্দগঞ্জে দেখা হবে।

ছোটো চিরকুটটা হাতে নিয়ে মজিদ পা বাড়ায় দোকানের দিকে। সাথে গণিত বই। এসএসসি পাস করতেই হবে তাকে। বাবার সাধ্যের বাইরে জেনেও অনেক বলেকয়ে প্রাইভেট টিউটর ঠিক করে গণিত আর বীজগণিতটা আয়ত্ত করতে চায় সে।

আগের হাল যেদিকে যায় পাছের হালও সেদিকে যায়– এ পুরাতন কথা সব তো মিথ্যে নয়। মজিদের বড়ো দুভাইও এ পথের পথিক কি না? তাই তো মজিদের ভয়। লেখাপড়ার খরচ জোগাতে না পেরেই তো তাদের বাবা একবার সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে আরেকবার ফুলপুকুরিয়া হাইস্কুলে টানাটানি করার পরেও ওদের আর এসএসসির পিঁড়িতে বসা হয়নি। ওখানেই ওদের পড়ালেখার পাঠ চুকে যায়। শেষে আর কী? ভালোই হলো, আর ওদের নিয়ে টানাটানি করতে হয়নি।

পুকুরপাড়ে বাঁশের টঙে ঘুমানোর চেষ্টা করেও মজিদের ঘুম আসে না। আসবেইবা কেমন করে? পেট তো চো চো করছে। গাছের ডালের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠতে দেখে মজিদ কী যেন মনে মনে বিড়বিড় করে বলে। হয়ত বলছে, রাত কত হতে চলছে বাবা এখনো বাজার সদাই নিয়ে আসেনি।

– কখন যে আসবে?

চাঁদ আস্তে আস্তে বাঁকা কোমর খাঁড়া করে উঠতে লাগল। রান্না শেষে সন্তানকে ঘুম থেকে ডেকে খাওয়ানোর তৃপ্তি সন্তানের চেয়ে বাবা-মায়েরই বেশি।

– ওকে এইটুকু দেই?

ও যে তোর ছোটো।

সন্তানের জন্য বাবার কত যে মায়া-মমতা অন্তরে থাকে, তা বাবা হলেই বুঝা যায়।

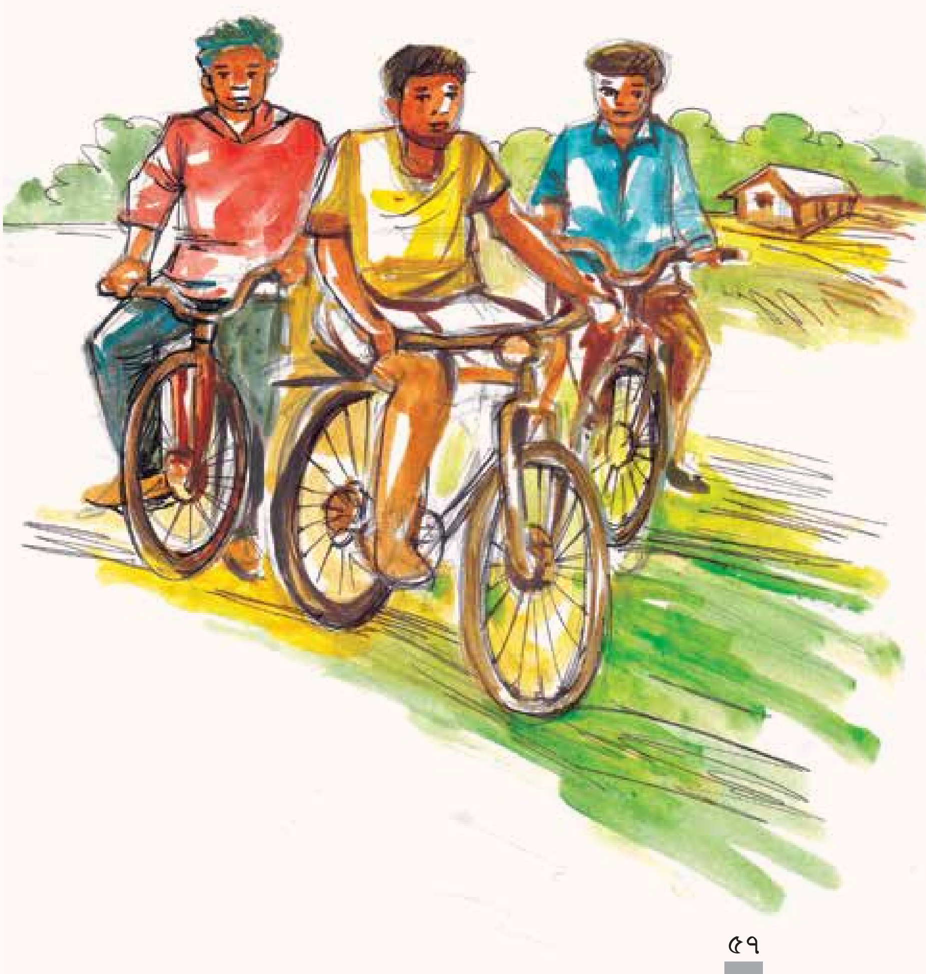

নিজের খাবারের কিছুটা সন্তানকে দিয়ে অভুক্ত থাকা কত আদর মাখা ভালোবাসা পৃথিবীতে ঘটে তার খবর কজন রাখে?

মজিদ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। বাবার শুকনো মুখটা আবার ভেসে ওঠে ওর চোখে। এখনো বাবা মায়ের মুখচ্ছবি ভুলতে পারেনি সে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কাজ করার সামর্থ্য যে নেই তা শরীর দেখলেই বুঝা যায়। তবুও হাতির মতো সংসার চালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেই চলছেন আজিজ সাহেব।

লেখাপড়ায় ডিগবাজি খাওয়া বড়ো দুজনকে কাজে লাগানোর চিন্তা মাথায় আসে বাবার। আরেকটু বড়ো হলে হয়ত মজিদকেও–

নুন আন্তে পান্তা ফুরোয় যাদের তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার স্বপ্নের রং ফিঁকে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপরেও চেষ্টার যেন অন্ত নেই মজিদের। টিউশন ফি, গ্রাম্য মক্তবে শিশুদের পড়ানোর ফি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার সাহস করে। স্যান্ডেল পায়ে নিলেমিপট্টির বেমানান পেন্ট কখনো বাঙালি লুঙ্গি পরে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় মজিদের কাছে।

পোশাক মনের উপর ছাপ ফেলে। অন্য দশজনের মতো বাবার মনেও তাই হলো। বাজার থেকে রেডিমেট প্যান্ট মজিদের জন্য নিলেও তাঁর পছন্দের কোটা দূরেই রইল।

মনে দানা বাঁধে, না পাওয়ার মিছিল। মিছিল ঠেকে এসএসসি' র টেবিলে লুঙ্গি পরা পর্যন্ত।

এ যাত্রায় এসএসসিটা পার হলো। না পাওয়ার বেদনায় একটু পাওয়ার আশা জাগে মজিদের।

আশা মানুষকে সামনে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। কেউ কিনার পায় কেউবা পায় না। তবু কতজনে স্বপ্ন দেখতে চায়, স্বপ্ন ছুঁতে চায়।

জীবনে পথ চলতে চায়। এত সহজেই কী আর পথ চলা শেষ হয়? শেষ হয় না। মজিদেরও তাই।

কলেজের পথে আবার আট কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ চলা শুরু করে মজিদ। হেলিয়ে পড়া কলেজের আম গাছগুলো ডালপালা নেড়ে নেড়ে বলে, মজিদ আয়, মজিদ আয়। কলেজে শুধু গেলেই চলবে না, পড়াশুনা তো করতে হবে।

পূর্বের সুরুজের সময় যতটুকু মন বসে, দুপুর গড়ালে পরের বেলায় তা আর বসে না। বসবেইবা কেমন করে? পেটের কয়লা তো সেই কখন– শেষ!

পড়াশুনায় জোড়াতালি দেওয়া মনটা দিয়েই বিকেলের টিউশনি সারে মজিদ। টিউশনিটা পড়াশোনার খরচ জোগাতে বেশ কাজে লাগে তার। যদিও লোকে বলে হাত খরচ, আসলে তার চেয়েও বড়ো। এই কাজটা উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠা অনেকের জীবনের পথ মসৃণ করেছে। তাই টিউশনি করাটা কখনই ভিন্ন চোখে দেখেনি মজিদ।

সময় পরিবর্তন হয়, আর মানুষের মন?

সময়ের সাথে মানুষের মনও পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হতে বাধ্য হয়।

কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই পরিবর্তনের হাওয়া দোল দিতে থাকে মজিদকে।

বেশ কদিন হলো মজিদের পা পড়ে না কলেজ চত্বরে। বেশ ফুরফুরে বাউণ্ডুলে সময় পার করছে সে। আজিজ সাহেবের নজরে না পড়লেও, যখন পড়ল তখন ভালোভাবেই পড়ল।

কাচারি ঘরে গ্রাম্য আদালতের বৈঠকের একপর্যায়ে ভিতরে এসে তিনি দেখেন মজিদ বহাল তবিয়তে বাড়ির মধ্যে নিশ্চিন্তে ফুরফুরে মেজাজে। কলেজে যাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছিল।

– কী ব্যাপার মজিদ, কলেজে যাসনি?

নিশ্চুপ মজিদ কী বলবে, কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, অথবা না কোনো উত্তরই আজ আর তার কাছে সহজ মনে হচ্ছে না। কী উত্তর দিবে মজিদ। অবশেষে–

– না,

– কেন?

– আমি আর হাঁটাহাঁটি করে কলেজে যাব না।

– হাঁটাহাঁটি মানে?

– আমি আর পায়ে হেঁটে কলেজে যাব না। সাইকেল লাগবে। সাইকেল না হলে কলেজে যাব না।

– সাইকেল পাব কই? আমার তো এই একটাই সাইকেল। তোকে দিলে আমি কাজে যাব কী নিয়ে? আর আমার পক্ষে তো আর সাইকেল কেনাও সম্ভব নয়।

– তা হলে আমার পক্ষেও আর কলেজে যাওয়া সম্ভব নয়।

– যাবি না

– না, শক্ত উত্তর মজিদের।

– দাঁড়া, তোর জন্য সাইকেল কেন, হেলিকপ্টার আনতেছি-

বলেই আজিজ সাহেব বড়ো মোটা দড়ি নিয়ে এসে মজিদের দুই হাত সাইকেলের ক্যারিয়ারের সাথে বেঁধে ফেললেন। শুধু কী বেঁধে ফেলা?

সাইকেল নিয়ে সামনে যেতে যেতে আজিজ সাহেব বললেন, আয় সাইকেলে চড়বি না আয়।

– এ এ ই কী করছেন চেয়ারম্যান সাহেব, ও না হয় ছেলে মানুষ। আপনিও দেখছি ছেলে মানুষ হলেন।

– তুমি জানো না মেম্বার, এই ছেলেটার কপাল সাইকেলের চাকার মধ্যেই আটকে আছে। ও আর বড়ো কিছু করতে পারবে? লেখাপড়া না করলে কী করে খাবে। বড়ো দুইজন তো গেছে।

এও দেখছি ঐ পথেই হাঁটছে। আমার কী আর জমিজমা আছে যে চাষাবাদ করে খাবে? আজিজ সাহেব পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন মেম্বারের দিকে।

গ্রাম্য আদালতে আসা মানুষগুলোও কিছুই যেন বুঝতে পারছিলেন না শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মেম্বার এসে মজিদের হাত খুলে দেন। আর আজিজ সাহেব দেন তার হাতের পুরানো সাইকেলটি।

ধর, নে সাইকেল। আমি না হয় হাঁটাহাঁটি করেই কামাই কাজ করি। সংসার তো আর তোদের না, সংসারটা তো আমার। এটা তো আর সংসার নয়, আস্ত একটা হাতি। হাতির খরচ তো আমাকেই জোগাড় করতে হবে। তোদের কী আর দায়দায়িত্ব আছে? আল্লাহ তো আমাকে অনেক বড়ো দায়িত্ববান করে পাঠিয়েছেন। আমি আগে মারা যাই, যখন সংসার করবি, তখন বুঝবি সংসার কাকে বলে।

ব্যাপারটি এরকম হয়ে যাবে কারোর কল্পনাতেও আসেনি। মজিদের মনে ক্ষণিকের মধ্যে কীসে যেন একটা অনুভূতি কাজ করল। সে এরকম আশা করেনি। ততক্ষণে বাবার বুকের চাপা ব্যথা অন্তরে অনুভূত হলো মজিদের।

দিন গড়িয়ে মাসের ধাক্কায় পরে। আজিজ সাহেব পায়ে হেঁটে এদিক সেদিক যান। দূরে জমি মাপার কাজ এলে সেখানে আর যেতে পারেন না। এতে তাঁর অনেক ডাক নষ্ট হতে থাকে।

একদিন বাজারের ব্যাগসহ তিনি হাঁটতে হাঁটতে ছেলে মজিদের সামনে এসে পরে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। অনেকটা পথ ব্যাগের ভার বহন করা তার জন্য সহজ ছিল না। শুধু কি ব্যাগের ভার? পুরো একটা সংসারের ভার। আর বয়সের ভারতো আছেই। এগুলো বহন করেই চলতে হচ্ছে তাকে।

বাবার বয়সের ছাপপরা মুখের ভাজগুলো মজিদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেতরে কী যেন একটা অনুভূতি কাজ করল। বাবার মুখের দিকে তাকাতে মজিদের এতটাই খারাপ লাগছিল যেন কালো মেঘের ছায়া। মজিদ আর কোনো চিন্তা না করেই বলে–

– বাবা, আমার ভুল হয়েছে। মাফ করো, সাইকেল লাগবে না।

আমি সাজু ভাইয়ের সাথে ওর সাইকেলে–

– কেন রে কী হয়েছে?

মজিদ নিশ্চুপ। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে সে।

– সাইকেলটা তেমন ভালো না। তাই না?

ওটা তো আর সাইকেল না, সাইকেলের মতো।

আচ্ছা ঠিক আছে কালকে না হয় মেকারের কাছ থেকে ঠিক করে নিব। এখন হলো তো যা। বলেই–

কালো সুতা দিয়ে বাঁধা পকেট ক্যালকুলেটরের বাটনে চাপ দেন আজিজ সাহেব। বাটনে কাজ করতেছে না দেখে বারবার চেষ্টা করতে থাকেন। কখনো কাজ করলেও সংখ্যাগুলো ছোটো হওয়াতে ভালো মতো দেখাও যায় না। তবুও ঘোলা চশমায় চোখে লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করেন।

মজিদের বুঝতে আর কষ্ট হলো না, বাবা কেমন আছেন। শুধু নিজের ভালোর জন্য আমি তাকে কষ্ট দিয়েছি। এই ভেবে সে অনুতপ্ত হতে লাগল।

এত কষ্ট করে বাবা জমিজমার হিসাব করেন? সেটাও আবার মানুষের! মানুষের জমিজমার হিসাব মিলাতে গিয়ে বাবার সংসারের জমাখরচের হিসাব মেলেনি, তাই বুঝি তার এ বয়সেও এ কাজ করতে হচ্ছে। একেই বলে ভাগ্য!

মজিদ নিজে থেকে নিজের অপরাধ বোধ অনুভব করে।

সামর্থ্য না থাকলেও সব বাবার সাধ আছে সন্তানের ভবিষ্যতের খুঁটিটা শক্ত করার জন্য।

সন্তানের সব সাধ-আহ্লাদ পূরণে তারা দিনাতিপাত করেন।

মজিদের আবদারের কথা বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে পীড়া দিতে থাকে। আর ভাবেন আবদার পূরণ করলে ছেলেটা হয়ত কলেজমুখী হবে। নইলে ওর বড়ো দুটোর মতো যদি হয়? আজিজ সাহেব ভাবনায় পরে গেলেন। যে করেই হোক ছেলেটার একটা সাইকেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সৎ নিয়ত করলে আল্লাহও একটা উপায় বের করে দেন। পরপর কয়েকদিন বেশ ভালো জমি মাপামাপির কাজ হাতে আসাতে আজিজ সাহেব ভাবলেন এবার মজিদকে একটা সাইকেল কিনে দিতে পারব। ছেলেটার আবদার পূরণ হলে সবার ভালো লাগবে।

ইচ্ছের শেষ বাতি জ্বেলে তিনশো টাকায় হরিপুরের শুকনা চৌকিদারের কাছ থেকে আজিজ সাহেব সাইকেল কিনে মজিদের হাতে দেন। সাইকেলটা হাতে নিয়ে মজিদ একবার সাইকেলের দিকে আর একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে–

– বাবা আমি তোমায় কষ্ট দিয়েছি, মাফ করো।

– আরে না, না। তোর কোনো দোষ নেই। তোর বন্ধুরা তো সাইকেল নিয়েই যায়। শুধু তুই বাকি ছিলি। তোকে সাইকেলটা দিতে পেরে আমারও ভালো লাগছে।

মন দিয়ে লেখাপড়া করবি। দেখবি তুই একদিন ভালো মানুষ হবি। তোর দ্বারা মানুষের ক্ষতি হবে না। অনেক মানুষ তোকে সম্মান করবে আর মনে রাখবে, আমি দোয়া করি।

মজিদ হিম শীতল হয়ে অশ্রুকণা সংবরণ করে–

হে! আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো আর বাবাকেও মাফ করো। তুমি তার ভালো করো। আমিন।

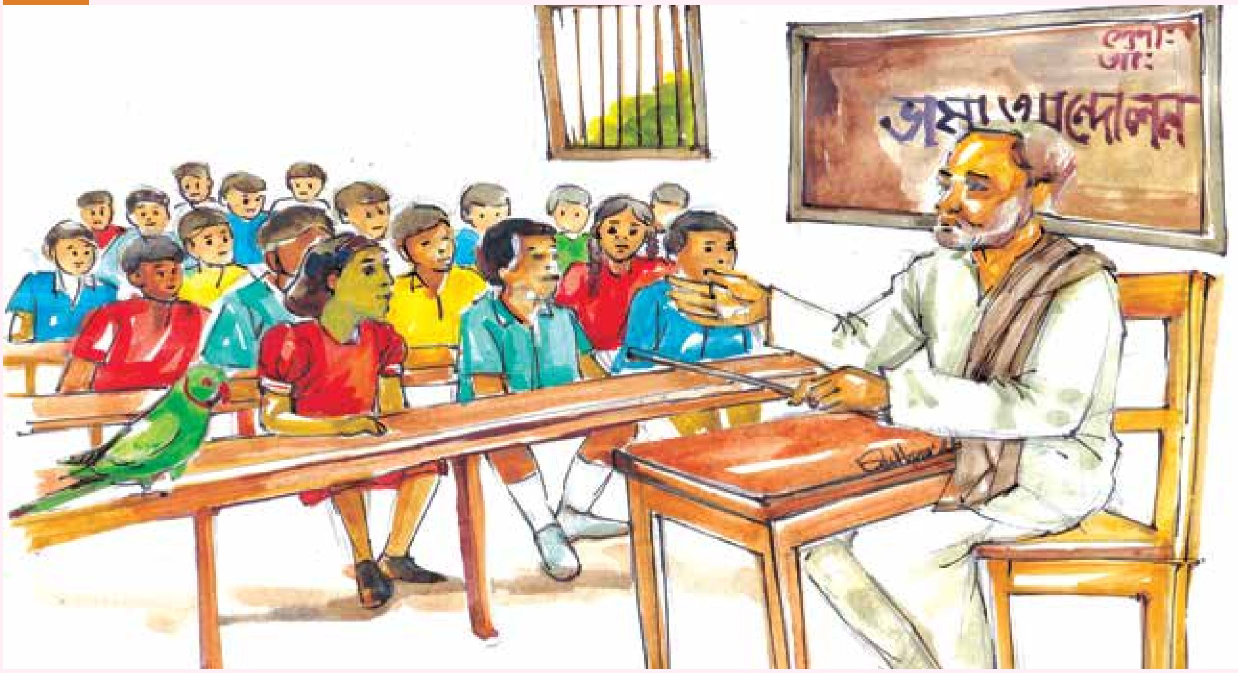

টিয়া পাখির পাঠশালা

জাহাঙ্গীর হোসাইন

টিয়া পাখির খুব ইচ্ছে হলো জ্ঞান অর্জন করবে। তবে তাদের জন্য তো কোনো পাঠশালা নেই। মানুষের জন্য এত এত পাঠশালা– এত এত বই পুস্তক। অথচ, তাদের জন্য কিছুই নেই। পৃথিবীতে সাম্য কোথায়? সাম্য এমনি আসে না। সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার অধিকার পাখিদেরও আছে। তাই টিয়া পাখি পাঠশালায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। একদিন টিয়া পাখি সত্যি সত্যি পাঠশালায় উপস্থিত হলো। তাকে দেখে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল আর বলতে লাগল, 'এই টিয়া পাখি– টিয়া পাখি'। এতে টিয়া পাখি বেশ খুশি হয়েছিল কিন্তু তার প্রাণ-ভয় ছিল। তাই সে উড়ে গিয়ে জানালায় বসল।

ছাত্রছাত্রীরা টিয়া পাখিকে ধরে আদর করতে চেষ্টা করল। টিয়া পাখি অবুঝের আদর-ভালোবাসা গ্রহণ করতে চায়নি। তার মূল কারণ হলো অবুঝরা আদর করতে গিয়ে তার পালক ছিঁড়ে ফেলবে। অসতর্কভাবে ধরতে গিয়ে হয়ত তার ডানাও ভেঙে ফেলতে পারে। তাই টিয়া পাখি উড়ে চলে গেল।

টিয়া পাখি আর কোনো দিন পাঠশালায় এলো না। ছাত্রছাত্রীরা প্রায় প্রতিদিন উঁকি দিয়ে দেখত টিয়া পাখিটি এলো কিনা। না–, টিয়া পাখি আর এলো-ই না। ছাত্রছাত্রীদের ধাওয়া খেয়ে সেই যে গেল আর এলো না। এতে ছাত্রছাত্রীদেরও খুব মন খারাপ হলো। কেন তারা টিয়া পাখিটিকে এমন করে ধাওয়া করল। ছাত্রছাত্রীরা খুব অনুতপ্ত হলো। তারা শপথ করেছে– টিয়া পাখি যদি আবার পাঠশালায় আসে তাহলে তারা টিয়া পাখিকে বিরক্ত করবে না।

তবে তাদের ভাবনা হলো টিয়া পাখিটি কেন পাঠশালায় এলো? এর আগে তো কখনো টিয়া পাখিটিকে তারা দেখেনি। কোথা থেকে এলো এই টিয়া পাখি। ছাত্রছাত্রীদের খুব ইচ্ছে হলো টিয়া পাখিটিকে আবার দেখার। কিন্তু না– টিয়া পাখি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আর দেখা দিলো না। এতে ছাত্রছাত্রীদের বেশ মন খারাপ হলো। একদিন পণ্ডিত মহাশয় শ্রেণিকক্ষে এসে ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের গতকালকের পাঠ কী ছিল?' ছাত্রছাত্রীরা বলার পূর্বেই টিয়া পাখি উড়ে এসে জানালায় বসে বলল, 'আমাদের ভাষা আন্দোলন'। টিয়া পাখির কথা শুনে সবাই অবাক হলো। ছাত্রছাত্রীরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কীভাবে জানো? তুমি কথা বলতে পারো?' টিয়া পাখি বলল, 'হ্যাঁ, বেশ পারি। প্রবাদে আছে– ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।' ছাত্রছাত্রীরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাদের ভাষা জানলে কী করে?' টিয়া পাখি অবাক হয়ে বলল, 'বা রে– তোমাদের ভাষা মানে! আরে– তোমাদের ভাষা মানে আমাদেরও ভাষা। আমরা বাংলাদেশের পাখি। সুতরাং আমাদের ভাষাও বাংলা। তোমরা যখন চেঁচামেচি করে আমাদের নাম ধরে ডাকো তখন তো আমরা বুঝি। আমরা তো বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বুঝি না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো– তোমরা প্রতীক অর্থাৎ বর্ণ ব্যবহার করতে পারো আমরা পারি না। তবে বর্ণের ব্যবহার ছাড়াও আমরা বাংলা ভাষায় পড়তে পারি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি।'

এতক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় চুপ করে সব শুনলেন। টিয়া পাখি পণ্ডিত মহাশয়কে লক্ষ্য করে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, 'মহাশয়, আপনার শ্রেণিকক্ষে আসতে পারি?' পণ্ডিত মহাশয় বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' ছাত্রছাত্রীরা টিয়া পাখিকে আসন ছেড়ে দিয়ে বসতে বলল। টিয়া পাখি আসনে বসার পর পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কীভাবে জানো গতকালকের পাঠ ছিল 'আমাদের ভাষা আন্দোলন'?" টিয়া পাখি বলল, 'আমার খুব

ইচ্ছে ছিল পাঠশালায় ভর্তি হব কিন্তু পরিবেশ আমার অনুকূলে ছিল না। পাঠশালার পেছনের ডুমুর গাছটায় বসে বসে আপনার পাঠ শুনতাম। পাঠ শুনতে শুনতে আমি বলতে শিখেছি। আপনার সকল পাঠই আমার মুখস্থ।' পণ্ডিত মহাশয় টিয়া পাখিকে বললেন, "আজকে থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষে এসে সবার সাথে বসে আমার পাঠ শুনবে এবং শিখবে। তোমরা সবাই শুনে রাখো– আজ থেকে আমাদের পাঠশালার নাম 'টিয়া পাখির পাঠশালা'।" পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে ছাত্রছাত্রীরা বলে উঠল, 'হুর রে! কী মজা! কী মজা!' টিয়া পাখিসহ সবাই আনন্দিত হলো।

পণ্ডিত মহাশয় টিয়া পাখিকে বললেন, "ঠিক আছে– গতকালকের পাঠ 'আমাদের ভাষা আন্দোলন' তুমি পাঠ করে শোনাও।"

টিয়া পাখি বলল, 'জি, মহাশয়, আমি স্মৃতি থেকে পাঠ করছি–

'আমাদের ভাষা আন্দোলন'

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিল বাঙালি– যারা মোট নাগরিকের প্রায় চুয়ান্ন ভাগ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) শুধু উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে বাঙালি ছাত্ররা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। সকাল নয়টায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হতে শুরু করেন এবং বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'ছাত্রদাবি মানতে হবে' 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই' 'নাজিম-নূরুল দুই ভাই/ এক দড়িতে ফাঁসি চাই' এরকম অনেক প্রতিবাদমুখর স্লোগানে স্লোগানে মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে– ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত এবং আব্দুল জব্বারসহ আরো অনেকেই। এছাড়া অসংখ্য ছাত্র-যুবক আহত হন। ২২শে ফেব্রুয়ারি নিহত হন শফিউর রহমান শফিক, রিক্সাচালক আউয়াল এবং অলিউল্যাহ নামের এক কিশোর। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার নিপীড়ন চালায়।

এ নির্লজ্জ, পাশবিক, পুলিশ হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে সে দিন পদত্যাগ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহিদস্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে উঠে শহিদ মিনার, যা ২৪শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দীন।

ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লিখিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রবর্তিত হয়। সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি করে। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সারা বিশ্ব দিবসটি গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করে।

পাঠ শেষে টিয়া পাখি সবার উদ্দেশ্যে বলল, 'বাংলা ভাষা শহিদদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। যারা প্রাণের বিনিময়ে আমাদের বাংলা ভাষার মান রেখেছেন। আসুন, আমরা ভাষা শহিদদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করি।'

ভাষা শহিদদের সম্মানে পণ্ডিত মহাশয়সহ সবাই টিয়া পাখির সঙ্গে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন।

মোবাইল ফোন আমদানিতে ৬০ শতাংশ শুল্ক কমিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মোবাইল ফোনের মূল্য ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ১০ শতাংশ করে ১৩ই জানুয়ারি প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এতে মোবাইল ফোন আমদানিতে প্রযোজ্য বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৬০ শতাংশ কমেছে। কাস্টমস ডিউটি হ্রাসের কারণে মোবাইল ফোন সংযোজনকারী দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে বিরূপ প্রতিযোগিতার মুখে না পড়ে সে লক্ষ্যে মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ ধার্য করে আরো একটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানিতে প্রযোজ্য বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫০ শতাংশ কমেছে।

এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২টি জারির ফলে আমদানি হওয়া ৩০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ মোবাইল ফোনের দাম আনুমানিক ৫ হাজার ৫০০ টাকা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি দেশে সংযোজিত ৩০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রতিটি মোবাইল ফোনের দাম আনুমানিক ১ হাজার ৫০০ টাকা হ্রাস পাবে।

সরকার কর্তৃক মোবাইল ফোন আমদানি এবং মোবাইল ফোন সংযোজন শিল্পের উপকরণ আমদানিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শুল্ক হ্রাসের ফলে সকল ধরনের মোবাইল ফোনের মূল্য সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে এবং দেশের নাগরিকগণের পক্ষে ডিজিটাল সেবা গ্রহণ সহজতর হবে মর্মে সরকার আশা করছে।

প্রতিবেদন: শিহাব শুভ

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা

দেলওয়ার বিন রশিদ

বাংলা আমার স্বরে অ স্বরে আ
মায়ের কাছে পড়া
নতুন বইয়ের রঙিন পাতায়
মজার মজার ছড়া।
বাংলা আমার মুখের ভাষা
গল্প-কথা- গান
বাংলা আমার ছন্দ সুখের
নদীর কলতান।
বাংলা আমার সুর সুমধুর
আমের আঁটির বাঁশি
চিরল চিরল জারুল পাতায়
কাঁচা রোদের হাসি।
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
স্বপ্ন-আশা সব
বাংলা আমার হৃদয় জুড়ে
খুশির কলরব।

একুশ বর্ণে বর্ণে

হাসু কবির

একুশ আমার মুখে-মুখে
একুশ আমার বুকে
একুশ আমার ধ্যান ধারণায়
একুশ সুখে-দুখে।

একুশ আমার ভাইয়ের শোকে
বোনের আহাজারি
একুশ মায়ের বোবা কান্না
বাবার কাঁধে ভারী।

একুশ আমার অহংকারে
একুশ রক্ত দানে
একুশ আসে রফিক শফিক
বরকতেরই প্রাণে।

একুশ আমার বর্ণে বর্ণে
একুশ উচ্চারণে
একুশ আমার চেতনাতে
অর্জিত হয় রণে।

ফুলের রঙে

নাটু বিকাশ বড়ুয়া

মায়ের ভাষা খুঁজতে গিয়ে
একুশ এলো ঘরে
পলাশ শিমুল ফুটলো দেখে
মন খুশিতে ভরে।

অ ভাষাটি খুঁজতে সেদিন
রাজ পথ হলো লাল
কৃষ্ণচূড়ায় ফুলের রঙে
মেতে রাখে ডাল।

আঁধার রাতের রুদ্ধ ভাষা
বলছে কথা রোজ
ভাষার তাগিদ রফিক সালাম
করল মায়ের খোঁজ।

ভাই হারানো কষ্টগুলো
অশ্রু ঝড়ায় আজ
পলাশ গাছে ডালে ডালে
করছে পাখি নাচ।

একুশ আছে বাংলা বুকে
রক্তে ভেজা গা
চোখের জলে বুক ভাসায়ে
কাঁদে আজো মা।

আমার ভাষা

নাজীর হুসাইন খান

আমার ভাষা বাবার ভাষা
আমার ভাষা মায়ের
আমার ভাষা শহুরে ভাষা
আমার ভাষা গাঁয়ের।

আমার ভাষা শুদ্ধ ভাষা
আমার ভাষা গাইয়া
ভাষার লাগি জীবন দিলো
রফিক, বরকত ভাইয়া।

জীবন দিলো আব্দুল জব্বার
আব্দুস সালাম ভাইও।
রবের কাছে তাদের লাগি
শান্তির দোয়া চাইও

আমার ভাষা দাদা-দাদির
নানা-মামা-চাচার
আমার ভাষা বীরের বেশে
সাহস নিয়ে বাঁচার।

তাঁতি-মুচি-কামার-কুমার
কুলি-মজুর-চাষির
আমার ভাষা মুক্ত স্বাধীন
সারা বিশ্ববাসীর।

আমার ভাষা প্রভুর ভাষা
প্রভুর থেকে চাওয়া
আমার ভাষা বায়ান্নতে
আন্দোলনে পাওয়া।

আমার ভাষা অনেক দামী
রক্তে কিনে আনা
আমার ভাষা সবার সেরা
বিশ্ববাসীর জানা।

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
বাংলাতে গাই গান
আমার ভাষা ছন্দে নাচে
কাব্যে জুড়ায় প্রাণ।

ঋতুরাজ বসন্ত

অরিত্র কুণ্ডু

শীতের ক্লান্তি সরিয়ে দিয়ে এলো ঋতুরাজ,
রোদ্দুর মাখা হাসি নিয়ে বদলালো আকাশ।
পলাশ-শিমুল আগুন রঙে জ্বালায় দিগন্ত,
প্রকৃতি জুড়ে উৎসব নামে– ঋতুরাজ বসন্ত।

আমের মুকুলে ভরে ওঠে হাওয়ার নরম গান,
মধু টানে মৌমাছির দল, জাগে প্রাণের টান।
পাখির ডাকে ভোর হয় যেন কবিতার অন্ত,
ছন্দে ছন্দে মিশে থাকে ঋতুরাজ বসন্ত।

কচি পাতায় সবুজ স্বপ্ন, ফুলে রঙিন মন,
মুছে যায় সব ক্লান্ত দিনের ধুলো-জরা-ক্ষণ।
মানুষেরও বুকের ভেতর লাগে নতুন স্পর্শ,
ভালোবাসার ভাষা খোঁজে ঋতুরাজ বসন্ত।

যেখানে ছিল নীরবতা, সেখানেই গান গেয়ে ওঠে,
বসন্ত ছোঁয়ায় জীবন ফেরে নিজের রঙে-ছোটে।
সব ঋতুর মাঝে তাই তো সে সবচেয়ে অনন্ত,
হৃদয়ের রাজা, প্রকৃতির প্রাণ– ঋতুরাজ বসন্ত।

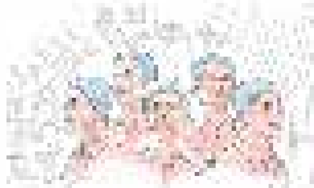

আমার যেতে ইচ্ছে করে

শামসুন্নাহার সুমনা

আমার যেতে ইচ্ছে করে সবুজ গাঁয়ের দেশে,
নদীর বুকে ঘুরতে সদা মাঝির নায়ে ভেসে।

যেথায় ভোরে কিচিরমিচির পাখির ঠোঁটে ঠোঁটে,
সবুজ গাঁয়ের মাথায় যেথায় ভোরের রবি ওঠে।

যেথায় রাখাল বিভোর থাকে বাঁশির সুরে মেতে,
দিবস জুড়ে কৃষাণ যেথায় কাজ করে রোজ ক্ষেতে।

যেথায় উড়ে বক, শালিক আর চড়ুই পাখির ঝাঁক,
রাত্রি হলে ভেসে আসে শেয়াল মামার ডাক।

বিকেল হলে খোলা মাঠে কিশোর করে খেলা,
গাঁয়ের বধূ ব্যস্ত ভীষণ সকাল সন্ধ্যা বেলা।

পাখপাখালি ঘরে ফেরে সন্ধ্যা নেমে এলে,
ছেলে মেয়ে পড়তে বসে মাটির পিদিম জ্বেলে।

আমার যেতে ইচ্ছে করে সবুজ গাঁয়ের দেশে,
যেথায় আছে মায়ের সোহাগ আঁচল তলে মিশে।

ফেব্রুয়ারি এলো ফিরে

খোরশেদ আলম নয়ন

ফেব্রুয়ারি এলো ফিরে
জ্বালিয়ে মনে আগুন,
বুকের মাঝে ঝলসে ওঠে
পলাশ রাঙা ফাগুন।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
স্বপ্ন দিয়ে আঁকা,
বিশ্ব জুড়ে আপন সুরে
আজ মেলেছে পাখা;

হাজার তারের বীণা বাজে
একটি বীণার সুরে,
বাংলা ভাষার ঢেউ জাগে তাই
সুদূর অচিন পুরে।

পলাশ -শিমুল কৃষ্ণচূড়া
রং মেখে তার অঙ্গে
বীর শহিদের রক্তকে দেয়
ছড়িয়ে শ্যামল বঙ্গে!

ঋতুরাজ

ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

পলাশ রাঙানো পথের ধারে,
শিমুল হাসে ডালে,
ফাগুন হাওয়ায় মাতাল আকাশ,
আবির মাখল গালে।

শুষ্ক পাতার বিদায় বেলা,
নতুন পাতার গান,
কুহূ তানে কোকিল ডাকে,
জুড়িয়ে দিতে প্রাণ।

বউ কথা কও ওই দূরে রয়,
বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ,
বসন্ত আজ দুয়ারে এসে,
জাগিয়ে দিল প্রাণ।

চলে গেলেন সুরকার শাহ নেওয়াজ

মো. ফুয়াদ হাসান

অনেক কালজয়ী বাংলা গানের প্রখ্যাত সুরকার ও সংগীত পরিচালক মো. শাহ নেওয়াজ আর নেই। ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি ভক্তদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।

বাংলাদেশের সংগীতভুবনে যে কজন সুরকার সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে শ্রোতাদের বিমোহিত করেছেন এবং আধুনিক বাংলা গানের নিজস্ব সুরময় বৈশিষ্ট্য নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে মো. শাহ নেওয়াজ ছিলেন অন্যতম। প্রচারবিমুখ ও নিভৃতচারী এই সুরকার ও সংগীত পরিচালক নীরবেই গড়ে তুলেছেন এক সমৃদ্ধ সংগীতভাণ্ডার।

বাংলা গানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য গানগুলোর একটি ‘দুই ভুবনে দুই বাসিন্দা বন্ধু চিরকাল/ রেললাইন বহে সমান্তরাল’। নজরুল ইসলাম বাবুর লেখা এই কালজয়ী গানের সুরকার ছিলেন মো. শাহ নেওয়াজ। বিটিভির নাটকে ব্যবহৃত শাহ নেওয়াজের সুরে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান ‘আশা ছিল মনে মনে প্রেম করিব তোমার সনে/ তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধিব গহিন বালুচরে’।

মো. শাহ নেওয়াজের সুরে আরও কিছু কালজয়ী গানের মধ্যে রয়েছে ওস্তাদ নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরীর গাওয়া দুটি বিখ্যাত গান, ‘জীবনানন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি সবকিছু ভুলে যেন করি লেনদেন, তুমিও তো বেশ আছ ভালোই আছ কবিতায় লেখা সেই বনলতা সেন’ এবং ‘এক ফোঁটা বিষ আজ আমার তিয়াস প্রিয়া মেটাবে’। ‘বন্ধু রে তোর মন পাইলাম না’। এছাড়া তাঁর সুরে আরও জনপ্রিয় কিছু গান হলো ‘আমি আর কার চোখ দিয়ে দেখব’, ‘চাঁদের পালকি চড়ে’, ‘এক নয়নে হয় না কান্দন’।

তাঁর করা সুরে গান করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, সৈয়দ আব্দুল হাদী, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, এন্ড্রু কিশোরসহ দেশের প্রায় সব খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী। দেশের বাইরেও তাঁর সুরে গান করেছেন ভূপেন হাজারিকা ও হৈমন্তী শুক্লা।

গত বছরের ৭ই ডিসেম্বর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কানাডার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও দুই পুত্রসন্তান এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সংগীতাঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নিভৃতচারী এই গুণী সুরকার নীরবেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বাংলা গানের ইতিহাসে তাঁর সুর দীর্ঘদিন শ্রোতার হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাজধানীর বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন— পিআইডি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাজধানীর বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন— পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 08, February 2026, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

www.dfp.gov.bd